সৌরীন্দ্রমোহন
মুখোপাধ্যায়
চালিয়াৎ চন্দর

চালিয়াৎ চন্দর

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বিরচিত

কিশোর উপন্যাস

সেই চালিয়াৎ চন্দর! মুখেযার বড় বড় কথা—হয়কে নয়, নয়কে হয় করা—এ যেন তার কাছে দুধ-ভাত। চালিয়াতী কথা বলে লোককে স্তম্ভিত করে দেবার তার জুড়ি নেই। বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েরা বহুদিন পূর্বে বইখানি পড়েছিলো; পড়ে আনন্দও পেয়েছিলো। যারা পড়েছিলো এখন তারা কেউ বৃদ্ধের পর্যায়ে, কেউবা যৌবনে। কিন্তু যাদের জন্য লেখা সেই কিশোর-কিশোরীরা বইখানি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে বহুদিন। তাদের দিকে চেয়েই চালিয়াৎ চন্দর গ্রন্থখানি আবার প্রকাশ করা হলো॥

পরিবেশক

এন ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

১৩, কলেজ রো / কলিকাতা—৯

প্রকাশক :
সৌমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
অন্নপূর্ণা পাল
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস :
১৩, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মূল্য—দশ টাকা মাত্র

রুমি অমি টুকু
গজু সতু
প্রাণাধিকেষু
বাবা
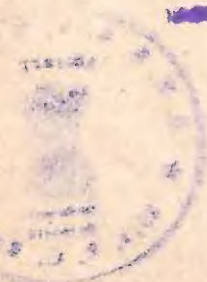
ভূমিকা

এ সংস্করণে রচনাটি পরিমার্জিত করেছি—তাছাড়া চন্দরের দুটি নতুন কাহিনী এ সংস্করণে যোগ করা হয়েছে। আশা করি এ সংস্করণ ছোটদের খুশী করবে।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এই লেখকের ঃ

বাংলার রূপকথা ১ম ও ২য় খণ্ড

রাশিয়ার রূপকথা

লালকুঠি

স্কুলে

গাঙ্গুলিদের চন্দর—পশ্চিমের কোন্ স্কুলে পড়তো। থার্ড ক্লাশে পড়বার সময় সে এলো কলকাতার স্কুলে পড়তে। কলকাতায় না পড়লে বুদ্ধি খোলে না—বাড়ীতে কান্নাকাটি বাধিয়েছিল, তাই তার মামার বাড়ী কলকাতা—সেইখানে এসে সে আস্তানা নিলে।

ছেলে বটে! এতবড় চালিয়াৎ ছেলের জোড়া নেই! মুখে সবসময় বড় বড় কথা, কেবল যত রাজা-উজীর মেরে বেড়ানোর গল্প। গাব্‌বেড়ের রাজা তার মামা—ঢাকুরের দেওয়ান তার পিসেমশায়—হাটখোলার নবাব তাদের বাড়ী প্রায় আসে, তার বড়দার সঙ্গে নবাবের ভারী ভাব,—এমনি কথায় ক্লাশের সকলকে সে অতিষ্ঠ করে তুললো। আমরা জানতুম, চন্দর মিছে কথা বল্‌ছে, কিন্তু চক্ষুলজ্জা আছে তো! কাজেই তার মুখের উপর তর্ক তুলে তার মামাকে গাব্‌বেড়ের রাজ-সিংহাসন থেকে নামিয়ে ফেলতে কিংবা ঢাকুরের দেওয়ানকে আমরা প্রকাশ্যে সন্দেহ করতে পারতুম না! চুপ করে চন্দরের এইসব অসহ্য মিথ্যা গল্প সত্য-কাহিনীর মত গলাধঃকরণ করতুম। মোনা কিন্তু মাঝে মাঝে বিড়-বিড় করে গর্জ্জন তুলতো, উঃ, কি মিথ্যাবাদী রে! কি চালিয়াৎ! কি শয়তান!

সেদিন পণ্ডিতমশায় আসেননি, ক্লাশে ক'জনে একটু আরামে গল্প জমিয়ে তুলেছি, আগের রাত্রে আশু এম্পায়ারে বোণ্টন সাহেবের ম্যাজিক দেখে এসেছিল, তার গল্প বলছিল। কিভাবে একটা ছেলের মাথা কেটে রক্তে রক্তপাত করে বোণ্টন সাহেব চক্ষের নিমেষে আবার তার কাটা মাথা জুড়ে তাকে বাঁচিয়ে তুললো ; একটা কাঁচের ইঁদুরকে পর্দা চাপা দিয়ে তার উপরে দুটো ডিম ভেঙে হাত নাড়তেই সেটা প্রকাণ্ড কুকুর হয়ে উঠে দাঁড়ালো—এইসব গল্প! শুনে আমাদের তাক লেগে যাচ্ছিল। চন্দরও বসে শুনছিল। আমরা তার মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলুম, আর ভাবছিলুম, কেমন, ম্যাজিক দেখে এসে আশু যা জমিয়ে তুলেছে, এর উপর তোমায় আর টেক্কা দিতে হবে না। আশুর কথা শেষ হলে চন্দর একটা বিশ্রী মুখভঙ্গী করলো। করে বললে, হুঁ! ও কি দেখেচে, ম্যাজিক দেখেচি সেবারে আমি লক্ষ্ণৌয়ের মচ্ছি-ভবনে। বড়দার সঙ্গে হাটখোলার নবাবের ভাব আছে না—তা লক্ষ্ণৌয়ের নবাব হলো আবার হাটখোলার নবাবের ভাগনে। সেবার বড়দাকে নিয়ে হাটখোলার নবাব লক্ষ্ণৌয়ে গেছলো। আমিও বায়না নিলুম, সঙ্গে যাবো—কাজেই বড়দাকে নিয়ে যেতে হলো......
গল্পের সূচনা দেখে আমাদের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। লক্ষ্ণৌয়ের নবাব হাটখোলা নবাবের ভাগনে! কোনো ইতিহাসে এমন কথা কখনো পড়িনি। কিন্তু পড়িনি তো অনেক জিনিষ। কাজেই তা নিয়ে তর্ক চলে না। কে জানে, কোন্ নবাব বংশের ইংরিজি ইতিহাসে হয়তো বা জিয়লজিকাল্ টেবল্ ছাপা আছে। অগত্যা চুপ করে চন্দরের সেই আজগুবি রূপকথা শুনতে হলো।

চন্দর বললে, আমাদের কি খাতির যে করলে। রোজ যাত্রা, বাইনাচ আর নবাবী কালিয়া-কোপ্তা খানা।

মোনা হেসে বলে উঠলো, জোয়ানের আরক নিয়ে গেছলি তো? না হলে পুঁইশাক-খাওয়া পেটে বেশী কালিয়া হজম হলো কি করে?

মোনার পানে চন্দর কট্‌মট্ করে একবার চাইলো, তারপর বলতে

লাগলো, পশ্চিমের জল-হাওয়ার গুণ কি কম, পাথর খেলে হজম হয়ে যায়……

আশু বললে, ঠিক বলেছিস্ ভাই, সেবারে দার্জ্জিলিং গেছলুম—তা একদিন বাজারের যত পসারী ধর্মঘট করলে, খাবার-দাবার কিছু মিললো না। শেষে আমরা পাহাড়ের পাথর কড়মড় করে চিবিয়ে খেলুম—আর হাঁ করে মুখ দিয়ে হাওয়া খাওয়া…পাথর যে কোথা দিয়ে হজম হয়ে গেল! কোথায় লাগে তার কাছে সাবু-বার্লি!

আশুর ঠাট্টা গায়ে না মেখে চন্দর সোজা বলে চললো, তা একদিন তুর্কিস্থান থেকে এক যাদুকর এসে লক্ষ্ণৌয়ের নবাবকে সেলাম করে বললে, কিছু খেলা দেখাবো শাহানশা।

আমরা সবাই তখন দরবারে বসে। নবাব বললেন, কি হে ছোক্‌রা, তামাসা দেখবে?

আমি বললুম, দেখবো!

নবাব হুকুম করলেন, দেখাও তামাসা।

যাদুকর তখন তামাসা দেখাতে সুরু করলো। প্রথমে দেখালো ছোট্ট একটি কাঁইবীচি। সেই কাঁইবীচিটি আমাদের হাতে দিয়ে বললে, এই তো কাঁইবীচি দেখচো সায়েব। এই কাঁইবীচি ছিল আলাদিনের ঠাকুর্দার—যে আলাদিন সেই আশ্চর্য প্রদীপ পেয়েছিল। এ কাঁইবীচি আলাদিনের ঠাকুর্দা ইজিপ্টের খেদিভ্‌কে বেচে যায়। খেদিভ্ একবার রোগ থেকে উঠে তাঁর হেকিমকে এই কাঁইবীচি বখশিস্ দেন। তারপর হেকিমের যখন খুব দুর্দশা হলো, তখন দিলেন এই কাঁইবীচিটি তুর্কির সুলতানকে বেচে। সুলতান কাশ্‌পিয়ান্‌সীর ধারে তাকে মস্ত জায়গীর দেন। তুর্কির সুলতান যাদুকরের বাপের হিকমৎ দেখে খুশী হয়ে সেই কাঁইবীচিটি তাকে বখশিস্ করেন—সেই অবধি কাঁইবীচিটি যাদুকরের ঘরে আছে। কাঁইবীচির কাছে যা চাওয়া যায়, তাই মেলে! গেলো জার্মান যুদ্ধের সময় যাদুকরের কাছে কাঁইবীচি ছিল, সে বেচারী তুর্কির সুলতানকে সাহায্য করবে বলে কাঁইবীচি নিয়ে

তুর্কি যাত্রা করে। কিন্তু যাবার সময় খাইবার-পাশের কাছে একটা পাথরে বেটক্করে হোঁচট খেয়ে বেচারীকে একেবারে শুয়ে থাকতে হয়—শেষে কাবুলের আমীর খবর পেয়ে তাকে নিজের প্যালেসে নিয়ে গিয়ে রাখেন। সেই কাঁইবীচি নিয়ে যাত্নকর যদি যেতে পারতো, তাহলে জার্মান-যুদ্ধের ইতিহাস একদম বদলে যেতো।

চন্দরকে যতই গাল দি, গল্প বলবার বাহাদুরী মোদ্দা তার খুব। এ গল্প যে স্রেফ্ আজগুবী, তা ঐটুকুনের মধ্যে জার্মানির যুদ্ধ, তুর্কির সুলতান, ঈজিপ্টের খেদিভ্, খাইবার পাশ্, মায় কাবুলের আমীরকে অবধি নামানোয় বেশ বুঝলুম, কিন্তু আরব্য উপন্যাসের রূপকথার মত গল্পটি বেশ জমে আসছিল। কাজেই তর্ক না তুলে শুনছিলুম। মোনা মাঝে একবার হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল,—লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের নাম বল্ দিকিনি? আমরা মোনার মাথায় চাঁটি দিয়ে তাকে বসিয়ে রাখলুম।

চন্দর বললে, এখন সেই কাঁইবীচিটি নিয়ে যাত্নকর বললে, বলুন নবাব বাহাদুর, কি চান্? আমি বলে উঠলুম, জার্মানির কাইজারকে দেখবো।

নবাব বললেন, আরে লউণ্ডা! আরে লউণ্ডা!

যাত্নকর বললে, বেশক্!

তারপর, বললে বোধ হয় বিশ্বাস করবে না ভাই, কড়কড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠলো, বিদ্যুৎ চম্‌কাতে লাগলো, আর দুপুর বেলায় দরবারে সকলে বসে আছি, ভেল্‌কি দেখছি—চক্ষের পলকে দিনের মত আলো নিবে একেবারে অমাবস্যার অন্ধকারে চারিদিক ভরে গেল। আমরা অবাক! হঠাৎ একটা চীৎকারে চমকে চোখ তুলে দেখি, সেই কাঁইবীচিটা মস্ত ডিমের মত হয়ে ফেটে গেছে আর তার খোলার মধ্যে কাইজার শুয়ে আছে! বেচারী! রোগা, হাড় জিরজির্ করছে! যাকে বলে অস্থিচর্ম্মসার! আমরা বললুম,—কাইজারকে তুই চিনলি কি করে?

চন্দর বললে, বাঃ! তাকে চিনবো না? ছবিতে যে একবার সে-গোঁফ দেখেছে, সে-মূর্ত্তি সে কি ভুলতে পারে? তোদের যেমন চিনতে পারি, কাইজারকেও ঠিক তেমনি।

মোনা বললে, কাইজার কিছু বললে?

চন্দর বললে, সে ভাই কি যে বললে, জার্মান ভাষা কি না, কাজেই কিছু বুঝলুম না। যাদুকর বললে, কাইজারের অসুখ। বেচারী ম্যালেরিয়ায় ভুগচে, বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না। তাকে হাসপাতাল থেকে আনা হয়েচে। কাজেই কাইজারকে তখনি ছেড়ে দেওয়া হলো। আমাদের দলে ছিল বুড়ো। গল্প শুনতে সে ভারী ভালবাসে। 'মৌচাক', 'সন্দেশ', 'মুকুল' অর্থাৎ ছেলেদের সব কাগজ সে নেয়, আর সে সব গল্প মুখস্থ করার চোটে স্কুলের পড়া তৈরী করবার ফুরসৎ পায় না।

বুড়ো বললে, তারপর কি হলো?

মোনা রাগে জ্বলে উঠলো। বললে, ফের যদি পাগলের মত আজগুবি গল্প বলবি চন্দর তো সত্যি বলচি, একটি ঘুষিতে তোর নাক ভেঙ্গে দেবো। এতে যদি স্কুল থেকে রাষ্টিকেট করে দেয়, সে বি আচ্ছা।

হঠাৎ বেরসিকের মত ঘুষির কথা উঠতে চন্দর বললে, ঘুষি কিসের!

গল্প বলবো না, ব্যাস্।

সেদিন এইখানে ইতি।

টিফিনের সময় আমাদের পরামর্শ চললো। বললুম, ছ্যাখো, চন্দর বড় বাড়িয়ে তুলেচে। কিছুতে শাণচে না। আমি যদি বলি, আকাশে একটা চাঁদ উঠেছে তো ও বলবে, একদিন রাত তিনটের সময় ও জোড়া চাঁদ দেখেছে। আমরা যদি বলি, মাঠে ঘোড়দৌড় দেখতে গেছলুম, ও বলবে, আবিসিনিয়ার মাঠে সেবার বড়দিনের ছুটিতে গিয়ে গণ্ডার-দৌড় দেখে এসেছে। এমন সব আজগুবি মিথ্যে বলে যে, সে-কথা নিয়ে তর্ক তুলতে ঘৃণা হয়। ওর গল্পের উপর টেক্কা দিয়ে আমাদের কিছু বলতে হবে।

মোনা বললে, আচ্ছা, আমি ওকে হারাবোই একদিন।

এর ঠিক এক বছর পরের কথা।

পূজার ছুটির পর স্কুল খুলেছে। কে কোথায় ছুটিতে গেছলুম, তার গল্প চলছে। সুধী, সৌম্য, গৌর,—ওরা কাশ্মীর ঘুরে এসেছিল—তার ছবি দেখাচ্ছে, আর গল্প বলছে। তাদের গল্প শেষ হতে অমল বললে, সে গেছলো বেতিয়ার ওদিকে। কোন্ পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে একটা

তাগ করে এ্যায়সা গুলি ছাড়লুম······

বোয়া সাপকে বাছুর গিলতে দেখে এসেচে। শুনে চন্দর একেবারে লাফিয়ে উঠলো।

চন্দর বললে, হুঁ! ও কি! আমি গেছলুম হাজারীবাগের

জঙ্গলে শিকার করতে। গিয়ে দেখি, একটা হাতীর ল্যাজ কামড়ে ধরেচে ইয়া এক কেঁদো বাঘ, আর বাঘটার গলা আঁকড়ে ধরেচে হাতীটা তার শুঁড় দিয়ে। বললে ভাই বিশ্বাস করবিনে, আমার হাতে ছিল একটা বন্দুক। তাগ করে এ্যায়সা গুলি ছাড়লুম যে, সেই গুলিতে বাঘ আর হাতী দুটোই কাৎ। হাতীটা খানিক ধড়ফড় করেছিল, বুনো হাতী কিনা, আর প্রকাণ্ড দেহ! তা দাদা এসে সেটার পায়ে আর এক গুলি মারে। বাঘটার কিন্তু আমার হাতের ঐ একটি গুলিতেই গয়া প্রাপ্তি!

বাঘটার কিন্তু আমার হাতের ঐ একটি গুলিতে…গয়াপ্রাপ্তি।

মোনা বললে, বাঘের চামড়া আর হাতীর দাঁত এনেচিস্ নিশ্চয়? তোর বাড়ী গিয়ে দেখে আসবো, আজই স্কুলের ছুটির পর। কথাটা

বলে মোনা আমাদের দিকে তাকালো। সে চাউনির মানে আমরা বুঝলুম! চন্দর কিন্তু ভড়কাবার ছেলে নয়। সে বললে, হাতীর দাঁত দুটো দাদা আগ্রায় পাঠিয়ে দেছে, দুগাছা লাঠি তৈরী করবার জন্য।

মোনা বললে, হাতীর দাঁতের লাঠি!

চন্দর বললে, সে দাঁত দুটো যে তিন হাত লম্বা। লাঠি যা হবে—ওঃ, দেখিস'খন। আর বাঘের ছালটা কশ্মীরে পাঠানো হয়েছে—রুমাল, মফ্‌লার, দস্তানা তৈরী করাবার জন্য। আসুক, দেখাবো বৈকি!

আমরা বললুম, তোকে তারিফ দি চন্দর! যা বলবি, তা একেবারে আটঘাট বেঁধে।

সকলে হো-হো করে হেসে উঠলো।

মোনা চুপ করেছিল। সে বললে, ও কি! আমার যা এ্যাডভেঞ্চার হয়েছে, চন্দর বিশবছর ধরে বানিয়েও তার উপর টেক্কা দিতে পারবে না!

সকলে বললুম, কি রকম?

মোনা বললে, আমিও এবার গেছলুম ঐ হাজারীবাগে। চন্দর যেদিন এক গুলিতে বাঘ আর ঐ হাতী মারে, সেদিন আমিও সেই জঙ্গলে ঢুকেছিলুম। যখন বাঘকে ও তাগ করছে আমি তখন একটা গাছে চড়ে বসে আছি। হাতী আর বাঘের লড়ালড়ির কাণ্ডটা চন্দর জানে না, ও পরে এসেছিল কি না! কিন্তু আমি জানি। গোড়া থেকে বলি শোনো।

চন্দরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। জীবনে প্রথম এই তার শুক্‌নো মুখ দেখলুম!

আশু বললে, বলরে মোনা, জুড়োতে দিস্ নে!

মোনা বললে, তোর মনে আছে চন্দর, হাতীটা যেখানে পড়েছিল তার বিশ হাত দূরে একটা পাথরের ঢিপি ছিল?

একটা আড়ষ্ট হাসি হেসে চন্দর বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা···

মোনা হেসে উঠলো বললে, সেই ডিপির উপর মস্ত একটা চালকুমড়ো আর তার ধারে ছোট্ট একটা ছাগল-ছানা বেঁধে রেখেছিলুম। আগেই হাতী আর বাঘটাকে দেখেছিলুম কি না। কুমড়োটা রেখেছিলুম হাতীর জন্যে—কুমড়োর মধ্যে বিষ দেওয়া ছিল! খেলেই হাতী মরবে, আর তার দাঁত নেবো। আর ঐ ছাগলটা ছিল বাঘের টোপ। হাতী আর বাঘ দুটোই একসঙ্গে এসে যে যার শিকার ধরে। বাঘটা ধরে ছাগলছানা, আর হাতী কামড় দেয় কুমড়োয়। দুটোই দুজনে খেয়ে শেষ করেছে, এমন সময়ে হঠাৎ ঝগড়া বাধলো। সেই তক্কে চন্দর এসে গুলি ছোড়ে। হাতীটা বিষমাখা কুমড়ো খেয়েছিল বলেই অত শীগগির গড়িয়ে পড়লো, না হলে চন্দরের গুলির সাধ্য ছিল না তাকে কাৎ করে। মানে, সেটা জাতে ছিল খাশ বোম্বাই হাতী। কি বলিস চন্দর, হাতীর পেট থেকে কুমড়োর বীচি আর বোঁটাটা বেরিয়েছিল কি না?

চন্দর কি করে, এতে সায় না দিলে মান থাকে না! কাজেই একটু ভোড়্কে গিয়ে সে বললে, তা ছিল বটে। তা—তা—

হেসে মোনা বললে, আর তা দিতে হবে না, গল্প তাতে আর এক ডিগ্রী বেশী ফুটবে না ভাই। তোমার গল্প তুমি তো শেষ করে দেছ—এখন বাকীটুকু আমি বলি, শুনে যাও। বুঝছোতো তুমি—সত্য গল্পই আমি বলছি, একটুও মিথ্যে বা বানানো নয়। তবে আমায় তুমি দেখতে পাওনি, এই যা দুঃখ।

চন্দর মাথা হেঁট করে রইলো। আমি বললুম, তা তুই দেখা দিলিনে কেন মোনা? হাতীর দাঁতে তোরও ভাগ ছিল তো।

হেসে মোনা বললে, না ভাই। তুচ্ছ দাঁতের জন্য বন্ধু-বিচ্ছেদ হয় যদি। সে আমার সহ্য হবে না।

মোনার পিঠ চাপড়ে আশু বললে, সাবাস্ মোনা! আজ চন্দর, তোমার হার।

চন্দর হুমকি দিয়ে উঠলো, মোনা! বলেই থেমে একটু নরম সুরে বললে, আমি আসি ভাই। ভারী তেষ্টা পেয়েছে।

সকলে ধরে তাকে বসালুম, বললুম, তাও কি হয়। চিরদিন আমাদের নানা গল্প শুনিয়ে আসচো—আজ তুমি একটা গল্প শোনো।

মোনা বলতে লাগলো, তারপর আসল এ্যাডভেঞ্চার ঘটলো। চন্দররা চলে গেলে গাছ থেকে নেমে বনের মধ্যে বাঘ ভাল্লুক হাতী

কালো মুখ, সামনে একটা মড়ার মাথা

খুঁজচি—খুঁজতে খুঁজতে এমন ঘন জঙ্গলে গিয়ে পড়লুম যে শেষে পথ হারালুম। পথ হারিয়ে ভাবচি, কি করি? এমন সময় হা-হা-হা অট্টহাসি—পাশেই! সেই হাসি শুনে চেয়ে দেখি, চারটে বুনো লোক! কি চেহারা! বাপরে! কেঁপে উঠলুম। হাতের বন্দুক হাত

থেকে খসে পড়ে গেল। তারা অমনি খপ্ করে তুলে নিয়ে হাঁটুতে ঠুকে বন্দুকটা ভেঙে চৌচির করে দিলে। আমাকেও বন্দী করে নিয়ে চললো তাদের সর্দারের কাছে।

জঙ্গলের মধ্যে এক পাহাড়। পাহাড়ের আড়ালে মস্ত এক গুহা। সেই গুহার মুখে বিরাট আগুন জ্বেলে সর্দার বসেছিল—কালো মুখ, সামনে একটা মড়ার মাথা। দাড়ি গোঁফ, লম্বা চুল। দুটো বড় দাঁত —যেন আমের কষি। সে মূর্ত্তি দেখে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। একবার ভাবলুম, যাক, চন্দরটা তবু বেঁচে গেছে। আহা, বন্ধুলোক। সে যে প্রাণ বাঁচিয়ে সরে গেছে, এদের হাতে পড়েনি, মস্ত ভাগ্যি। এদিকে যদি চন্দর এগুতো, তাহলে সেও গিয়েছিল।

সর্দ্দার উঠে আমার গা টিপে পরখ করে দেখলে, তারপর হেসে বললে, কটা আনলে ?

আমি ভাবলুম, কজনকে এনেছে বুঝি তাই জিজ্ঞাসা করচে! ও বাবা, শেষে দেখি, তা নয়। সে কথার মানে হলো—কড়া আন্ রে। মানে বুঝলুম কি করে। ঐ কথা শুনেই ভূতের মত পাঁচ-সাতজন লোক ছুটলো একদিকে। খানিক পরে দেখি, মস্ত একটা কালো কড়া তারা বয়ে নিয়ে আসচে। কড়াখানা বললে হয়তো বিশ্বাস করবি নে, এত বড় যে তার মধ্যে আমাদের ক্লাশের এই বাহাত্তর জন ছেলেকে কুটে চিংড়ীর মত ফেলে, তাতে মশলা বাটা আর একগাদা পুঁইশাক দিলে খাশা পুঁই-চচ্চড়ি বানানো চলে।

শিউরে আমি বললুম, বলিস কি ?

মোনা বললে, আর বলি কি। কড়া দেখে আমার দু চোখ কপালে উঠলো। একটা গাছের সঙ্গে সর্দার আমায় পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললে, আর তার লোকজন এক মস্ত উনুন জ্বালালো। উনুনে আগুন যখন বেশ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেচে, তখন কোথা থেকে মুসলমানী পোষাক-পরা এক ছেলেকে এনে তার হাতে দড়ি বেঁধে গাছের ডালে

টাঙ্গিয়ে দিলে—ঐ গন্‌গনে উনুনের উপর! সর্দার বললে—ঠিক হয়েচে। এটার শিক্‌-কাবাব বানিয়ে খাবো।

একটি গাছের সঙ্গে সর্দার আমায় পিছমোড়া করে বাঁধলে

চোখের সামনে জল-জ্যান্ত ছেলেটাকে ঝল্‌সিয়ে খাবে। আমার হাড় অবধি কেঁপে উঠলো। মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছিল—আমি চোখ বুজলুম! তারপর আবার যখন চোখ খুললুম, দেখি, সে ছোকরা নেই! উনুন জ্বলচে, আর সেই উনুনের উপর রাক্ষুসে কড়া চাপানো। কতকগুলো লোক খানিকটা জায়গা সাফ করে দেদার মড়ার খুলির সঙ্গে ভল্লুকের রোঁয়া, হাতীর ল্যাজ, বাঘের নাড়ী-ভুঁড়ি মিশিয়ে

সেগুলো মশলার মত পিষচে! পেষা হলে এক ঘড়া রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে সেটা একটা কড়ায় ঢাললো—ঢেলে আমার বাঁধন খুলে আমায় ধরে কড়ার কাছে নিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে সর্দারণী এসে হাজির! সর্দার আর সর্দারণীতে মহাতর্ক। সর্দার বললে, কচি মানুষের ঝোল খাবো আমি।

সর্দারণী বললে, না, ঝাল-চচ্চড়ি।

মুখের তর্ক শেষে মারামারিতে দাঁড়াবার জো! শেষে মীমাংসা হলো —বেশ, দু রকম রান্নাই হবে। মুড়োর ঝোল আর চচ্চড়ি।

ভয়ে আমি কাঁপছি। সর্বনাশ হলো। আস্ত গোটা শরীরটা কড়ায় না দিয়ে তাকে দু'টুকরো করে কাটবে।

ফোড়া কাটতে হবে শুনে ভয়ে একবার গায়ে ছাই মেখে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী সেজে বেরিয়ে পড়েছিলুম—গায়ে ছুরি বসাতে এত আমার ভয়। আর সেই আমাকে বঁটিতে ফেলে মাছের মত কুটবে? বাপরে! তখন ওদের লোক ছুটেছে বঁটি আনতে। আমি দুর্গা নাম জপ করতে লাগলুম! হোক কলিকাল, তেমন করে ভক্তি-ভরে ডাকলে মা দুর্গা সত্যিই কি সে-ডাক শুনবেন না?

মা দুর্গাকে ডাকচি আর ডাকচি, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো— তোমারা মা দুর্গাকে বিশ্বাস না করলেও আমি করি।

আমরা বললুম, কি কাণ্ড ঘটলো?

মোনা বললে, মা দুর্গার মহিমা ছাড়া সে কাণ্ড ঘটতে পারে না। সে ঘটনা চন্দরও জানে। বল না চন্দর···

আমরা বললুম, কি রে চন্দর?

হতভম্বের মত চেয়ে চন্দর বললে, আমি কি জানি আবার? বারে! মোনা বললে, জানিস্ না? বটে! চালাকি। সেই যে····· হঠাৎ ধুরুম্-ধুম্ বন্দুকের আওয়াজ! সর্দার বলে উঠলো, কে আসে? সর্দারণী বললে, তাইতো? ঝোল, চচ্চড়ি কিছুই হলো না। সর্দার

বললে, দাও ওকে কড়ায় ফেলে। সাঁৎলে নাও—ইংরেজরা রোষ্ট্ খায়—আমরাও এ ছোকরার রোষ্ট্ খাবো।
এই না বলে আমায় ধরে দিলে সেই কড়ার মধ্যে ঝপাৎ করে ফেলে। আমি তখনি অজ্ঞান।
শিউরে আমরা বললুম, তারপর ?

চন্দরের পানে একবার চেয়ে মোনা বললে, জ্ঞান হতে দেখি, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি। শুনলুম, চন্দরবাবু বলে আমার এক বন্ধু লোকজন নিয়ে গিয়ে পড়াতে বুনোর দল বন ছেড়ে পালায়। চন্দরই আমাকে কড়া থেকে আধ ঝল্সানো অবস্থায় তুলে হাসপাতালে আনে।
আমরা বললুম, তোর পিঠে পোড়া দাগ কৈ ? দেখি।
হেসে মোনা বললে, হু-পিপে জাম্বাক ঘষে সে ঘা সারে। দাগ মিলিয়ে গেছে। তোমাদের বিশ্বাস না হয়, চন্দর সামনে রয়েছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করো—হুঁ, একে জাম্বাক ওষুধ, তায় পশ্চিমের হাওয়া…
হাসি চেপে আমরা চন্দরের পানে চাইলুম, বললুম, হ্যাঁ চন্দর, এ কথা সত্যি ?
চন্দর হঠাৎ মোনার পায়ের কাছে ঝুম্ করে পড়্লো, পড়ে বললে, তোর পায়ের ধূলো দে ভাই মোনা। আমরাও ছুটোই, মানি ; কিন্তু সে ছোটা ভেটো ঘোড়ার ছোটা। তার তুলনায় তোর ছুটোনো—সত্যি রে, যেন মোটরের ছুট্।
চালিয়াৎ চন্দর হার মেনেছে। আনন্দে চাঁদা তুলে এ্যায়সা এক গ্র্যাণ্ড ফীষ্ট্ লাগালুম আমরা পরের রবিবারে।

চন্দরের মামাতো ভাই তেজু প্রায় সমবয়সী।

কলকাতায় আসবার ক'দিন পরেই সে তার চালিয়াতীর গল্পে তাদের আসর সরগরম করে তুললো।

একদিন ট্রামে চড়তে গিয়ে সে আছাড় খেলো।

তেজু বললে, বাঁধবার আগে কেন চড়তে গেলে ?

চন্দর বললে, এখানে কি ছাই শুধু মোটর আর ইলেকট্রিক ট্রাম। হাতীতে চড়বার উপায় নেই। উট! উটে চড়েছিস ?

তেজু তার পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলো।

উট! উটে চড়বে কি ? জীয়ন্ত উট সে কখনো চোখেও দেখেনি। বইয়ের পাতায় উটের ছবিই যা দেখেছে।

চন্দর বললে, আমাদের ওখানে উট, হাতী, পাহাড়, ঝর্ণা, মরুভূমি!

তেজুর চোখ দুটো গোল হয়ে রইলো, চোখের পাতা আর পড়ে না। পাহাড়! মরুভূমি! জিয়োগ্রাফিতেই তাদের নাম শুনেছে, আর ম্যাপে কালির হিজিবিজি দেখলেই বুঝেছে, ওগুলো পাহাড়!

তবু সে বললে, চড়ো দিকিনি তুমি বাইসিক্ল দেখি।

চন্দর বললে, আরে রামচন্দ্র। বাইসিক্লে চড়তে আমার কোনো কালে সাধ হয় না। চ'দিকিনি আমাদের ওখানে···আমাদের বাড়ীর পাশে এক সাহেব থাকে—আন্‌কোরা জার্মান-সাহেব—তার একটা এরোপ্লেন আছে। সেই এরোপ্লেনে চড়ে আমি চায়না গেছলুম। বেলা তখন আটটা কি ন'টা, সাহেব বললে, Well স্যাণ্ডার, প্লেনে চড়বে ?

আমি বললুম, চড়বো। ব্যস, চড়ে বসলুম। হুশ্‌ করে সাহেব প্লেন চালিয়ে দিলে। একেবারে দেখতে দেখতে পাঞ্জাব, কাশ্মীর ছাড়িয়ে হিমালয় পর্বত পার হয়ে তিব্বতের উপর দিয়ে হাজির মহলু

চায়নায়। গ্রেট্ ওয়াল অফ চায়না, পড়েছিস তো? সেই গ্রেট্ ওয়াল অফ চায়না একটা উইয়ের ঢিপির মত দেখাচ্ছিল। প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি।

সাহেব বললে, ওই ঢিপিগুলো কি বলো তো?

বাধা দিয়ে তেজু বললে, সাহেব বললে ঢিপি?

চন্দর বললে, ঢিপি বলেনি, সাহেব বললে ঢিপ্পু। ঢিপিকে জার্মানরা বলে ঢিপ্পু। আমি বললুম, না, কি ও? সাহেব তখন বলে দিলে, ওই হলো গ্রেট্ ওয়াল অফ চায়না। শুনে আমার ভয় হলো। ওরে

সেই মাঠে হোগলার চালা বেঁধে প্রায় বিশ হাজার চীনেম্যান বসে জুতো সেলাই করছে।

বাবা, বাড়ীতে না বলে একবারে চায়নায় এসেছি ফিরতে কত দেরী হবে। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, পিকিং-এর রাজবাড়ী। চীনেম্যান

পাহারা দিচ্ছে, আর চীনা সেনাদের প্যারেড চলেছে। আর এক জায়গায় দেখি, মস্ত মাঠ, আর সেই মাঠে হোগলার চালা বেঁধে প্রায় বিশ হাজার চীনেম্যান বসে জুতো সেলাই করছে।

সাহেব আমায় বললে, চীন দেখলে। এবার রাশিয়া দেখবে?

আমি বললুম, না সাহেব, আজ থাক। বাড়ীতে বলে আসিনি!

সাহেব তখন এরোপ্লেন ঘুরিয়ে বাড়ী ফিরে এলো। বেলা তখন সাড়ে দশটা। আমি যে ইণ্ডিয়া ছেড়ে একেবারে চায়না গেছলুম, তা কে বলবে? ভাব্ দিকিনি, কোথায় ইণ্ডিয়া আর কোথায় চায়না! তারপর খেয়ে দেয়ে স্কুলে গেলুম। বাড়ীতে কাকেও বলিনি—বলে কে মার খাবে। তারপর ঠাকুমার যে রকম শুচিবাই, বলবে, এ্যা, চীনে গেছলি। ওরে হতভাগা, গোবর খেয়ে প্রাচিত্তির কর। মরি আর কি গোবর খেয়ে!

শুনে তেজু তো অবাক! চায়নার কথায় অবাক নয়, চন্দরের আজগুবি গল্পের দৌড় দেখে অবাক। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক চলে না—মামার বাড়ীতে চন্দরের খুব আদর। একে তারা বরাবর বিদেশ থাকে, তার উপর তার বাপ ভালো চাকরি করেন।

অথচ ছেলেমহলে তার গল্পের দৌড়ে হাঁফিয়ে উঠলো! রাজা-উজীরের কথা ছাড়া চন্দর কথাই কয় না।

মামা সেদিন মেয়েদের কি একখানা গহনা দেখাচ্ছিলেন, চন্দর তার মধ্যে হুম্ করে বলে উঠলো, এ ভালো গহনা নয় মামা, গহনা দেখেছিলুম সমরখন্দে, রাজার গায়ে—সমরখন্দের রাজা যেবার বরোদার দরবারে আসেন……

মামা মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু যেভাবে গুণধর ভাগনের পানে তাকালেন, ভাগ্যে এ'কালে রাগলে মানুষের চোখে আগুন জ্বলে না। তা জ্বললে চন্দর বুঝি সে দৃষ্টিতে ভস্ম হয়ে যেত।

ঘরে বাইরে এমনি গল্পের জোরে চন্দর দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠলো। তার গল্প শুনে সকলের গা জ্বলে উঠতো। কিন্তু ম্যাপ ছাড়া ইউ. পি.

বা পাঞ্জাব, চায়না বা কাশ্মীর কেউ চক্ষে দেখেনি, কাজেই তা নিয়ে কি তর্ক তুলবে ?

একদিনের কথা বলি ঃ

খুব বৃষ্টি হয়ে কলকাতার রাস্তা নদী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক'খানা বাঁশ বেঁধে ভেলা করে ভুলু জলে ভাসাচ্ছে দেখে সকলে আমোদ পেয়ে মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে তুললো। ভুলু বলে উঠলো, পথে নদী দেখেছো, চন্দরদা ?

চন্দর মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠলো, হুঁ, এ কি! সেবারে দিল্লীতে গেছলুম এগ্‌জিবিশন দেখতে। সে যা ব্যাপার হয়েছিল—সকালে যমুনা হঠাৎ এমন ফেঁপে উঠলো যে জল বেড়ে ঘরবাড়ী ডুবে একশা। আমি তখন উঠেছি কুতুবমিনারে। নীচে জল, আর জল। কুতুব থেকে ঝাঁপ খেয়ে সাঁতরে একদম আগ্রার তাজমহলের উপর গিয়ে তবে দাঁড়াতে পাই! উপায় ছিল না—সারা দিল্লী তখন জলের নীচে!

ভুলু বললে, চালাকির কথা! অতখানি সাঁতরে গেছ। যা বললে তাতে হাত-পা ভারি হয়ে যাবে না মশায় ?

চন্দর বললে, যমুনায় সে কি টান্ রে! জলের উপর আমি স্রেফ শুয়ে রইলুম। টানে ভেসে ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে একেবারে আগ্রা। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তোরা যদি যমুনা দেখতিস্ তো বলতিস্ তাই বটে! থাকিস্ সকলে এই লক্ষ্মীছাড়া শহরে—যমুনার কি জানবি ?

ভুলু বললে, আচ্ছা, চলো তো একদিন গঙ্গা নাইতে। কেমন সাঁতার কাটো দেখি।

চন্দর বললে, দূর! এই গঙ্গা না কি আবার একটা নদী! যত চট্‌কলের ময়লা ভাসা নালা। গঙ্গার জলে কত রোগের ব্যাসিলি আছে তা জানিস্। যমুনার জল কত চমৎকার। কালো জল। সাধে কি আর যমুনার ধারে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন রে। সে বাঁশীর সুরে যমুনায় উজান বইতো।

কোথাকার কথা কোথায়। ওস্তাদ ছেলে বটে।

তার এইসব গল্পের জ্বালায় মামাতো ভায়েরা আড়ালে বসে কেবল জল্পনা করতো, এমন একটা কিছু ঘটানো যায়, যাতে চন্দরের এ দর্প খর্ব হয়। কিন্তু কি করে, কি করে তা হয়?

এমন সময় এক মজা হলো।

বাড়ীতে মামীমা-মাসিমারা সকলে বললেন, নবদ্বীপ দেখতে গেলে হত কিন্তু কে সঙ্গে যাবে? মামারা কাজকর্মে ব্যস্ত, যাবেন না।

বড় মাসিমা বললেন, চন্দর খুব চৌখোস চালাক ছেলে আছে। ট্রেনে যেতে হলে ওকেই সঙ্গে নিতে হয়।

চন্দর বললে, অল্ রাইট।

তাই ঠিক হলো। ই. আই. আর-এর টাইম টেবল্ ঘেঁটে ঠিক হলো, সকাল সাড়ে ছ'টার ট্রেনে চড়ে বেলা সাড়ে দশটায় সকলে নবদ্বীপে পৌঁছুবেন। তারপর সারাদিন সেখানে ঠাকুর-টাকুর দেখে রোদ পড়লে সন্ধ্যা ছ'টায় নবদ্বীপ ছেড়ে রাত সাড়ে ন'টায় আবার হাওড়ায় ফেরা। নবদ্বীপে চড়ুইভাতি করে খাওয়া-দাওয়া হবে। ছেলে মেয়েরাও যাবে, আর দলের গাইড হয়ে যাবে চন্দর।

যাবার দিন চন্দরের সে যা ভাব হলো। ওঃ, নড়তে চড়তে খালি সকলকে হুকুম করে। একজন চাকর সঙ্গে চললো। মস্ত মোট হলো —প্রাইমাস ষ্টোভ, এলুমিনিয়মের হাঁড়ি, ডেকচি, তাছাড়া চাল, ডাল, ঘী, তেল, আনাজ তরকারী।

মামীমা-মাসিমারা আর মামাতো-মাস্তুতো ভাইবোনেরা মিলে মস্ত দল···গুণতিতে সবশুদ্ধ চৌদ্দজন, তার উপর একটা চাকর। টিকিট কিনতে চন্দর হিমসিম্ খেয়ে গেল! কোথায় টিকিট নিতে হয় জানে না—ইণ্টার ক্লাসের টিকিট চৌদ্দখানা, আর চাকরের একটা থার্ড ক্লাশ। ইণ্টারের টিকিট এক টাকা বারো আনা করে, আর থার্ড ক্লাশ টিকিট এক টাকা পনরো পয়সা। তিনখানা দশ টাকার নোট নিয়ে

চন্দর একবার এদিক ওদিক করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাইয়েরা বললে, আমরা প্লাটফর্মে যাই।

চন্দর বললে, না, খবরদার। হারিয়ে যাবি।

ভাইয়েরা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন ছাড়বে ৬টা ৩০ মিনিটে—স্টাণ্ডার্ড টাইম। বড় ঘড়ির পানে চেয়ে চেয়ে সকলে দেখছে। ঘড়ির বড় কাঁটা বারোটার ঘর ছাড়িয়ে ১, ২, ৩, ৪ পার হয়ে গেল, তবু চন্দরের দেখা নেই।

বড়মামীমা বললেন, ওরে, চন্দর গেল কোথায়? ট্রেন ফেল করাবে না তো? সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। মেজ মাসিমা বললেন, কিছু ভাবিস্‌নে বৌ, সে ঠিক আসবে। ওর মুখে শুনিস্ তো—হিল্লী দিল্লী মক্কা করে বেড়াচ্ছে···এ তো তুচ্ছ নবদ্বীপ। চালাক ছেলে। আমাদের তেজু-ভুলু নয় তো।

এ কথা শুনে তেজু-ভুলুরা মনে মনে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলো, হে ঠাকুর, দাও এবার ওর দর্প চূর্ণ করে। যাক্ ট্রেন ফেল হয়ে, না হয় না যাবো নবদ্বীপ।

ভুলু বলে উঠলো, দর্পহারী মধুসূদন, তুমি যদি থাকো, ওর দর্প চূর্ণ করো। প্লাটফর্মে খুব ভিড়। হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠলো, কি রে, তোরা এখানে?

সকলে ফিরে দেখে, তেজুর বাপের এক বন্ধু গোপেশবাবু। ইনি ই. আই. আরে চাকরি করেন। ভুলু তাঁকে খুলে বললে ব্যাপার। তিনি বললেন, আচ্ছা আয়, আমি তোদের বসিয়ে দিয়ে আসি। টিকিট যে আনতে গেছে, সে আসবে'খন।

কিন্তু তাকে চিনবে কে? টিকিট এনে যদি সে সকলকে খোঁজে?

গোপেশবাবু বললেন, ভুলু না হয় এখানে দাঁড়াক······

তাই হলো।

সকলে গিয়ে ট্রেনে চাপলো। মাসিমারা অস্থির হয়ে উঠলেন। চন্দর। চন্দর কোথায়?

ট্রেন ছাড়তে আর তিন মিনিট বাকি। সকলে খুব ভাবিত হয়ে উঠেছেন—চন্দরের জন্য তত নয়, বিনা টিকিটে ট্রেনে যাচ্ছেন বলে, যদি পুলিশ ধরে। এমন সময় ভুলুর হাত ধরে টানতে টানতে চন্দর এসে হাজির—একেবারে গলদঘর্ম! পাঞ্জাবির হাতা ফেঁশে নিশেনের মত উড়ছে। কপালের কাছে একটা ছড়া দাগ—রক্ত পড়ছে, নাকটা ফুলে উঠেছে।

গাড়ীতে এসে সে বসলো। সকলে এক কামরাতেই বসেছিল। বড় মাসিমা বললেন, কি হয়েছে রে?

চন্দর বললে, এই জন্যেই তোমাদের বাঙলাদেশ আমি পছন্দ করি না। ছোটলোকের জায়গা। এতবড় ষ্টেশন—তার কোথাও যদি ভালো বন্দোবস্ত থাকে। টিকিটঘরে দশটা ফোকর—এ ফোকরে যাই, টিকিট চাই—বলে, নবদ্বীপের টিকিট এ দোরে নয়, ও দোরে! এমনি ঘুরে ঘুরে টিকিট নেবার জন্য টাকা দিয়েছি—পিছন থেকে কি ধাক্কা। চেঞ্জ ছিটকে পড়ে গেল। তুলতে গিয়ে খোট্টার লাঠির গুঁতো লাগলো নাকে। তারপর পয়সাও কতক গেল হারিয়ে। রাম বলো! রাম বলো! একি ভদ্দর লোকের জায়গা।

ট্রেন ছাড়লো। চন্দর হিসেব কষতে বসলো, চৌদ্দ খানা টিকিট এক টাকা বারো আনা করে···তা হলে চৌদ্দ ইনটু এক টাকা বারো আনা, হলো গিয়ে···ভাইবোনেরাও অঙ্ক কষতে সুরু করলে—চৌদ্দখানা ইণ্টার টিকিটে চব্বিশ টাকা আট আনা, আর একখানা থার্ড ক্লাশে একটাকা পনেরো পয়সা—সবশুদ্ধু পঁচিশ টাকা এগারো আনা তিন পয়সা। ত্রিশ টাকা থেকে পঁচিশ টাকা এগারো আনা তিন পয়সা বাদ দিলে বাকি থাকে চার টাকা চার আনা এক পয়সা। পকেট ঝেড়ে সিকি-আধুলি টাকা-পয়সা জড়ো করে গুণে চন্দর দেখে, আরে, মোটে এক টাকা দু'আনা দু'পয়সা! বাকি—

ভুলু বললে, ক'খানা টিকিট কিনতে তিন টাকা হরির লুট দিয়ে এলে চন্দরদা!

চন্দর চুপ। তার কপালের শিরাগুলি ফুলে উঠেছে। বড় মাসিমা বললেন, যাক্‌গে পয়সা। ও যে প্রাণ নিয়ে ফিরেছে এই ঢের।
চন্দর বললে, ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা, এ কি ষ্টেশন! কোনো রকম ব্যবস্থা নেই। হতো যদি আমাদের প্রতাপগড় ষ্টেশন···হুঁ! ষ্টেশন মাষ্টার নিজের ঘরে চেয়ার টেনে বসিয়ে টিকিট দেয়···
ট্রেন চলতে স্থুরু করলো। তেজু বললে, এই ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে থাকবে চন্দরদা?
চন্দর বললে, অন্যায় হয়েছে। খাকী সার্ট আর হাফ প্যাণ্ট হলো রেলওয়ে জার্নির যোগ্য একমাত্র পোষাক। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে কি মানুষ ট্রেনে যায়?
ট্রেন চলেছে। চন্দর দারুন অস্বস্তি জানাতে লাগলো চায়ের জন্যে। বড় মাসিমা বললেন, তোমার যে দেরী হলো বাবা, নাহলে হাওড়া ষ্টেশনে স্বচ্ছন্দে চা খেতে পারতে।
মেজ মাসিমা বললেন, ও বদ রোগ ছেড়ে দাও চন্দর। চা না খেলে শরীরে জুৎ পাবে না এই বয়সে। এ কি কথা!
ভুলু বললে, ব্যাণ্ডেলে চা খেয়ো চন্দরদা। গাড়ী সেখানে অনেকক্ষণ থামে। আটটা আঠারোয় ব্যাণ্ডেল।
চন্দননগর ছাড়তেই চন্দর বললে, টাইমটেব্‌লটা দেখি রে।
টাইমটেব্‌ল্ দেখে চন্দর বললে, ঠিক হয়েচে। ওখানে ট্রেন প্রায় পনেরো মিনিট থামবে। সেই তক্কে চা খেয়ে নেবো।
তেজু বললে, ঐ ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে যাবে?
জামাটা ছেড়ে রেখে চন্দর বললে, গেঞ্জি গায়ে দিয়ে যাবো তাতে কি!
ব্যাণ্ডেলে গাড়ী থামতে না থামতে চন্দর দোর খুলে ওড়াক্ করে দিলে এক লাফ প্লাটফর্মে। যেমন লাফ দেওয়া অমনি আছাড়। তেজুরা সকলে হো-হো করে হেসে উঠলো। মামীমা-মাসিমারা আহা-আহা করলেন। চন্দর কারো পানে না চেয়ে তীরের মত সোঁ করে উধাও হয়ে গেল।
মেজ মাসিমা বললেন, ভারী গোঁয়ার!

ছোট মাসিমা একালের মেয়ে। তিনি মানুষ চেনেন। তিনি বললেন, একে গোঁয়ার্তুমি বলে না, এ হলো আহাম্মকী।

ছোট মাসিমার উপর তেজু যা খুশী হলো।

তারপর চন্দরের দেখা নেই। বড় মাসিমা বললেন, আবার কোথা গেল? আঃ! ছাখো দিকিনি বাপু, যদি গাড়ী ছেড়ে দেয়।

সকলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চাইতে লাগলো। দেখে, চন্দর একখানা খবরের কাগজ কিনে সেখানা মেলে ধরে পড়ছে।

তেজু বললে, ঐ যে…ঐ ওখানে কাগজ পড়ছে।

মেয়েরা বলতে লাগলো, ওরে, ডাক্, ডাক্। গাড়ীতে বসে কাগজ পড়া যায় না।

ভুলু বললো, সাহেবমানুষ কি না।

বড় মাসিমা ধমক দিয়ে বললেন, তুই থাম্‌তো—তোর না দাদা হয়?

ছেলের দল চুপ। তারপর গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা বাজলো, আর দৌড়ুতে দৌড়ুতে চন্দর এসে গাড়ীতে উঠলো। দৌড় কামরায় উঠতেই এক আছাড়। সকলে আবার হেসে উঠলো। চন্দর বললে, ই- আই. আর-এর গাড়ীগুলো যেন কি।

তারপর নির্বিবাদে যাত্রা। বাঁশবেড়ে, ত্রিবেণী, খামারগাছি, জিরাট ছাড়িয়ে বলাগড়। ট্রেন থামলো। প্লাটফর্মে আম বিক্রি করছিল। বড় মামীমা বললেন, কত আম ছাখো! কিছু নিলে হতো না, ঠাকুরঝি? কথাটা বড় মাসিমাকে বলা হলো। চন্দর বললে, আম চাই?

মেজ মাসিমা বললেন, তোমায় নামতে হবে না বাবা। যে গোঁয়ার ছেলে তুমি। আমওয়ালাকে ডাকো।

ডাকা হলো আমওয়ালাকে। সে আসতে চায় না। প্ল্যাটফর্মে ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে।

চন্দর বললে, আমি গিয়ে নিয়ে আসি মাসিমা।

বড় মামীমা ছুটো টাকা দিলেন, আর একখানা ঝাড়ন দিয়ে বললেন, ছু'টাকার আনো তাহলে…

ভুলু বললে, গাড়ী কিন্তু এখনি ছাড়বে, ভুলে থেকো না যেন।
চন্দর বললে, তুই থাম্ গাধা।
চন্দর চলে গেল। দু'টাকার আম কেনা—দর করতে না করতে ঘণ্টা বাজলো—ট্রেণও দিল ছেড়ে। সকলে চীৎকার করতে লাগলো, চন্দরদা, ও চন্দরদা—
কে শোনে সে ডাক। চন্দরদা আমের দর করতে মত্ত! ট্রেন প্লাটফর্ম ছেড়ে চললো। মেজ মাসিমা বললেন, ওরে থামা, ট্রেন থামা, ও যে পড়ে রইলো। কি ছেলে বাবা! চেনটা ধরে কেউ টান না হয়!
ভুলু বললে, চেন টানলে ৫০ টাকা জরিমানা।
ছোট মাসিমা বললেন, তোমাদের যেমন রকম!
ভুলু বললে, ট্রেন বেশীক্ষণ থামবে না, ওই বা গেল কি বলে? আচ্ছা ছেলে!
ও না হয় গেছে, এখন উপায়? টিকিটগুলো?
ভুলু বললে, চন্দরদার জামার পকেটে। এই যে টিকিট আছে। কিন্তু চন্দরের উপায় কি হবে? ভুলু টাইম-টেবল্ দেখে বললে, বলাগড় থেকে নবদ্বীপে আসতে হলে বেলা চারটের আগে ট্রেন নেই।
ট্রেন ইতিমধ্যে এসে পরের ষ্টেশনে সোমরাবাজারে থামলো। গাড়ীর মধ্যে তখনো নানা তর্ক আর জল্পনা চলেছে। ট্রেন ছেড়ে দিল।
তেজু টাইম্ টেবল্ দেখে বললে, পরের ষ্টেশন গুপ্তিপাড়া থেকে ট্রেন ছাড়বে ১১টা ৩৭ মিনিটে—সে ট্রেন বলাগড় পৌছুবে ১২টা ৭ মিনিটে।
মেজ মাসিমা বললেন, নন্দা এই ট্রেনে যাক্ দিদি। গুপ্তিপাড়ায় ওকে নামিয়ে দাও বাপু...পয়সা কড়ি নিয়ে ও যাক। ছেলেটা তবু খেতে পাবে। কি যে করলে। একলা পড়ে থাকবে। নবদ্বীপ মাথায় থাক...ভাখতো, এই ট্রেনে ফিরলে হাওড়ায় পৌছুবো কখন?
টাইম টেবল্ দেখে তেজু বললে, বেলা তিনটেয়।
ছোট মাসিমা বললেন, এই ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে—আচ্ছা কর্মভোগ বাপু। তোমরা যাই বলো, চন্দরের অত কথা শুনে আমি তখনি

বুঝেছিলুম, ও খালি বাক্যিবাগীশ। এখান থেকে এইটুকু আসতে কি কেলেঙ্কারীই না করলে। অত বড় ছেলে।

তেজুরা যা খুশী হচ্ছিল। ওঃ, থ্রী চীয়ার্স ফর্ ছোট মাসিমা!

ভুলু বললে, তার চেয়ে এক কাজ করো বরং···গুপ্তিপাড়া থেকে এই ট্রেনে চড়ে বলাগড়ে পৌঁছে সেখান থেকে চন্দরকে নিয়ে চলো ত্রিবেণী যাওয়া যাক।

বলাগড়ে ট্রেণ এলে সকলে দেখে, চন্দর আমের ঝুড়ি নিয়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে

ছোট মাসিমা বললেন, সেই ভালো। নেহাৎ ধুলো পায়ে বাড়ী না ফিরে ত্রিবেণী হয়ে যাওয়া যাবে? তাতে কষ্ট কম হবে, ত্রিবেণী-স্নানও ঘটবে।

তাই হলো। গুপ্তিপাড়ায় নেমে আবার টিকিট কেনা। তারপর ত্রিবেণীর ট্রেনে চাপা।

বলাগড়ে ট্রেন এলে সকলে দেখে, চন্দর আমের ঝুড়ি নিয়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। সকলকে নামতে দেখে ও এগিয়ে এসে বললে, তোমরা ফিরলে কেন? ফিরতি ট্রেনে আমি তোমাদের সঙ্গে উঠে বাড়ী ফিরতুম। আমার জন্য ভাবনা কি! হুঁ, যমুনাবাদের নবাবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে এসেছিল এদিকে তার মাসির বাড়ীতে। ছাড়লো না। কতকগুলো জাহাঙ্গীর-কাটলেট্ খাওয়ালো জোর করে, আর নূরজাহান্ পরোটা। তারপর কতকগুলো আমও খেয়েচি। সারাদিনের মত আহার হয়েছে। আঃ, তোমরা ব্যস্ত হয়ে কেন যে ফিরলে?

ছোট মাসিমা বললেন, তা বোঝবার শক্তি যদি তোমার থাকতো, তাহলে কি আর এমন বুদ্ধিমানের মত আম কিনতে নামতে বাবা।

ভুলু চুপিচুপি চন্দরের পাশে গিয়ে বললে, যমুনাবাদের নবাব কি ঐ কুলিটা চন্দরদা?

চন্দর ফোঁশ করে উঠলো, ভারী ফাজিল হয়েছিস বটে। আমি না তোর বড় ভাই হই—গুরুজন।

তেজু বললে, চায়না জাপানে যদি যাওয়া হতো, তা হলে কি আর এমন ঘটতো? মোদ্দা, চায়না যেতে যে কীর্তি দেখাতে পারোনি, নবদ্বীপ যাত্রায় তা দেখালে চন্দরদা!

চন্দর বললে, কি! কি কীর্ত্তি দেখিয়েছি আমি?…র‍্যাস্কেল!

তেজু বললে, সত্যি, এ কি কীর্ত্তি! চন্দরদার কাছে এ তো নস্যি!

সেই চালিয়াৎ চন্দর! ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢুকলো ইণ্টার-মিডিয়েট পড়তে। আমিও ঐ কলেজে ঢুকলুম। অনেকের সঙ্গে তার হলো বন্ধুত্ব। কি করে, তার একটু ইতিহাস আছে। অর্থাৎ তাকে তারাও চিনলো অচিরে।

ক্লাশের মাঝামাঝি একটা বেঞ্চে সে বসে। ধুতি পরেই ক্লাশে আসে। হাঠাৎ একদিন দেখি, তার বর্মীজ বেশ। আমরা অবাক্! লজিকের ক্লাশ শেষ হতে আমরা চার-পাঁচজনে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করলুম, হঠাৎ এ-সাজে কলেজে এসেছেন!

মৃদু হেসে চন্দর বললে, মানে, পোষাক বদলাবার সময় পাইনি। এক জায়গায় নিমন্ত্রণ গেছলুম···দশটা বেজে গেল, কাজেই সেখান থেকে সোজা কলেজে এসেছি!

বিস্ময়ে আমরা পরস্পরের পানে চাইলুম! মানে, আমরাও নিমন্ত্রণে যাই, তা বলে এমন বেশ! পরক্ষণে চন্দরের পানে তাকালুম, চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। চন্দর বললে, বর্মার যুবরাজ কলকাতায় এসেছেন না! গার্ডেনরীচে আছেন। আমার কাকা তাঁর গার্জ্জেন টিউটর···আমাদের ভারী খাতির করেন। সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল।

আমাদের ভারী শ্রদ্ধা হোলো। বর্মার যুবরাজের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা। এ লোকের বন্ধুত্ব কাম্য। চন্দরের বন্ধুত্বের গর্বে লোকসমাজে আমাদেরও প্রতিপত্তির সীমা থাকবে না।

এমনি করে আলাপ সুরু।

দু'হপ্তা পরে ধর্মতলার মোড়ে চন্দরের সঙ্গে দেখা। আমরা বায়স্কোপ দেখে ফির ছি, রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। চন্দরের গায়ে মুসলমানী পোষাক—সিল্কের আচকান্, সরু পায়জামা, মাথায় ফেজ। চিনতে

পারলুম না। সে নিজে এসে পিঠ্ চাপড়ে ডাকলো, কি রে শত্রুঘ্ন···
আমি বললুম, কে? আরে চন্দর যে! আমি ভেবেছিলুম, আখেরি-
চাহার-শাম্বা!
চন্দর বললে, চ'লেছি খিদিরপুরে। ওয়াজিদ আলি শার শালীর বিয়ে!
আমার মামা তাঁর ম্যানেজার। সেই বিয়ের নিমন্ত্রণ।

চন্দরের গায়ে মুসলমানী পোষাক—সিল্কের আচকান, সরু পায়জামা, মাথায় ফেজ।

আমি বললুম, হেঁটেই?
চন্দর বললে, এ পথটুকু ট্রামে যাবো। তারপর খিদিরপুরের কাছে-

নেমে একখানা ট্যাক্সি ধরবো। তারা গাড়ী পাঠিয়েছিল, আমি বলেছি, সন্ধ্যার পর যাবো। কাজ কি তাদের গাড়ীতে গিয়ে। ভাববে, ক্যাংলা, পেট ধুয়ে বসেছিল।

শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠলো। এমন শ্রদ্ধা যে মুখে কথা ফুটলো না। চন্দর এক পয়সার মিঠা খিলি কিনলো…সেই সঙ্গে একটু জর্দা, তারপর চট্ করে মাঠের দিকে চলে গেল।

পরের দিন কলেজে চন্দর এলো নিত্যকার সাজে। পরণে ধুতি, গায়ে একটা টুইলের সার্ট। আমি প্রশ্ন করলুম, কাল কখন ফিরলে?

চন্দর বললে, ওঃ, রাত তখন প্রায় একটা।

আমার মনের মধ্যে এক প্রচণ্ড সমারোহের ছবি জাগছিল। নবাব বাড়ীর উৎসব…নাচ-গান-বাজনা।

চন্দর বললে, নাচ হচ্ছিল। এক রাশিয়ান ডান্সার এসেছিল…আনা পাব্‌লোভার কি রকম মামাতো বোন হয় শুনলুম। কি নাচই নাচলে! ওঃ! Oriental Style অজন্তার ছবি দেখেছো?

বললুম, দেখেছি।

চন্দর বললে, তাহলে idea করতে পারবে! সুন্দর সে ছবি। নাচের সঙ্গে বাজনা বাজালো একজন বাঙালী। তাঁর নাম নৃপেন মজুমদার। ইনি এককালে আমার মামার কাছে সাকরেদী করেছিলেন—এখন রাশিয়ায় থাকেন।

শ্রদ্ধার ভারে আমার মুখের কথা বুকের কোন্ গহনে লুকালো, তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

পরের দিন হিষ্ট্রি-ক্লাশে প্রফেসর আসেননি, আমরা তুমুল কলরব জাগিয়ে তুলেছি। সত্য বললে, ওহে, চন্দরের গুণের পরিচয় পেয়েছি। কাল আমার পিশ্‌তুতো ভাইয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ গেছলুম, সেখানে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো। তার নাম অঘোর। অঘোর সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়ছে। অঘোর বলছিল এই চন্দরের কথা। বললে, ওর মত চালিয়াৎ ছেলে ভারতবর্ষে এর পূর্বে কখনো জন্মায়নি।

আমরা সকৌতূহলে সত্যর মুখের পানে চেয়ে রইলুম। সত্য বললে, আগাগোড়া চাল। নবাব-বাদশার কথা ছাড়া মুখে আর কোন কথা নেই। জঙ্গি সহরের নবাব, কোদালীয়ার রাজা ওদের ভারী দোস্ত।

আমি বললুম, বর্মার যুবরাজের গল্প তাহলে ভূয়ো?

সত্য বললে, বিচিত্র নয়। গোড়া থেকেই আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল।

আমরা অভিসন্ধি পাকাতে বসলুম, চন্দরের জারীজুরী ভাঙা চাই।

বরুণ বললে, আমাদের ছাপাখানা আছে। আমি ব্যবস্থা করবো।

বেশ।

চারদিন পরে একখানা খবরের কাগজ হাতে বরুণ এসে ক্লাশে দেখালো, তার একটা কলমে ছাপার অক্ষরে লেখা, "বর্মার যুবরাজের গৃহে আজ সন্ধ্যায় মস্ত পার্টি। সেই পার্টিতে নাচ, গান, বায়োস্কোপ, ম্যাজিক প্রভৃতির আসর বসিবে। এই আসরে গান গাহিবে শ্রীমান হরিসখা মিত্র। হরিসখার বয়স দশ বৎসর মাত্র। এ বয়সে কালোয়াতী গানে শ্রীমান আশ্চর্য পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে।"

ছাপা খবরটুকু চন্দরকে দেখানো হলো। দেখে চন্দর বললে, ও, হ্যাঁ, আজ পার্টি আছে বটে। আমি যাবো ঠিক করেছি—তবে ছোট বোনটার বড্ড অসুখ চলেছে···

বরুণ বললে, এই হরিসখা কে, জানো? আমাদের সত্যসখার ছোট ভাই। শুনে চন্দর শুধু বললে, ও।

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব গম্ভীর হলো।

কাগজখানা সে টেনে দেখলো। কাগজের নাম, The Rangoon Charibari.

সত্যসখা বললে, এক কাজ করলে হয়, আমার ভাইকে ওরা নিয়ে যাবে সন্ধ্যার আগে। আমি অত আগে যেতে পারবো না, তা চন্দরবাবু, আপনি কখন যাচ্ছেন?

চন্দর উদাস মনে বললে, আমায় পাঁচটায় যেতে বলেছে। তবে বোনটার অসুখ।

সত্য বললে, আমি মোটর নিয়ে আপনার বাড়ী যাবো'খন। Say, রাত আটটায়। হরির গান হবে সাড়ে আটটায়···তারপর ন'টায় ফিরে আসবো।

চন্দর বললে, আমি যদি যাই তো সন্ধ্যের আগেই যাবো। না হলে প্রিন্স দুঃখ করবেন। তবে মুস্কিল হচ্ছে এই বোনের অসুখ নিয়ে। যদি কোনো রকম complication হয়? ক'দিন ভারী সোরগোল যাচ্ছে কি না।

আমি বললুম, বেশ তো, সত্যর সঙ্গে রাত্রে থাবেন। সেখানে বলবেন, বোনের অসুখের জন্য দেরী হলো।

চন্দর আমার পানে চেয়ে কি ভাবলো, তারপর সত্যর পানে চেয়ে বললে, বেশ, তাই আসবেন। যদি অসুবিধা না ঘটে, একসঙ্গে যাবো।

সেই বন্দোবস্ত পাকা বইলো এবং তার ফলে রীতিমত একটি অভিনয়। অর্থাৎ সত্য গিয়ে চন্দরের দ্বারে হানা দিল সন্ধ্যা ছ'টার পরে। আমি আর বিনোদ গলির মোড়ে পায়চারি সুরু করলুম। এই পায়চারির অন্তরালে মাঝে মাঝে পথ থেকে চন্দরদের বাড়ীর বাহিরের ঘরে উঁকি দিয়ে কখনো দেখি, সত্য একা বসে; কখনো দেখি, দু' একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছে: কখনো দেখি, একটা চাকর এসে জলের গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে। সে দিব্যি এক জায়গায় আরামে বসে আছে, কিন্তু আমার আর বিনোদের পা যে ঘুরে ঘুরে টাটিয়ে উঠলো। এমন করে মানুষ কতক্ষণ পায়চারী করতে পারে?

সত্যকে একবার ইঙ্গিত করলুম, রাত তখন সাড়ে আটটা। সত্য নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো, এসে বললে, চাকরটা বললে, চন্দর দাদাবাবু বাড়ী নেই। ডাক্তারের বাড়ী গেছেন। খুকীর ভারী বোখার। কিন্তু ঐ যে বাবু দুটিকে দেখলে, ওঁরা হলেন চন্দরের মামা। দুজনেই অফিসে কাজ করেন। তাঁরা বললেন, চন্দরকে বাড়ীতে দেখছি না তো। সে বাড়ী নেই।

আমি বললুম, ওঁদের জিজ্ঞাসা করলে না কেন, প্রিন্স অব্ বর্মার ওখানে নিমন্ত্রণে গেছে কিনা?

সত্য জবাব দিল, করেচি বৈকি? শুনে তাঁরা অবাক। বললেন, প্রিন্স অব্ বর্মা! তাঁরা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তারপর বোনের অসুখের খবর জিজ্ঞাসা করতে তাঁরা বললেন, বাড়ীতে অসুখ তো কারো নেই। আরো জানলুম, এটা চন্দরের মামার বাড়ী।

আমরা বুঝলুম, চন্দর ভেগেছে। সত্য একদম মরিয়া হয়ে বললে, আমি কোনমতে হঠবো না। বাড়ীতে ও নেই এটা ঠিক, কিন্তু ফিরবে তো? সত্যই কিছু বর্মার যুবরাজ ওকে আটকে রাখবে না!

সত্য বললে, না তাড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত নড়চি না।

আমি বললুম, আমি কিন্তু বিদায় নেবো ভাই। বেশী রাত হলে ওদিকে বাড়ীতে ঢুকতে পাবো না। বড়দা ভারী strict।

বিনোদ বললে, আর কতক্ষণ এমন পথে পথে ঘুরবো? তুমি মোদ্দা ওদের বাড়ীতে সারা রাত থাকবে কি বলে?

সত্য বললে, না তাড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত নড়্‌চি না।

আমাদের ফিরতে হবে বুঝছিলুম, তবু কৌতূহল ছিল সীমাহীন. কাজেই রয়ে গেলুম।

মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকান। দুজনে দু'পেয়ালা চা খেলুম, আর দু'খানা করে কাটলেট। তারপর দোকানদারের সঙ্গে আলাপ জুড়লুম, এমন চা কলকাতায় কোনো দোকানে খাইনি। কাটলেটও অপরূপ। বিলিতী হোটেলের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে।

দোকানদার বললে, কেন হবে না? গ্র্যাণ্ড হোটেলে আমি কিছুকাল কাজ করেছি...তা ভালো লাগলো না। ভাবলুম, দুত্তোর! বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। পরের নোকরি ছেড়ে স্বাধীন ব্যবসা করবো।

দোকানদার হাসলো। দাঁতগুলি পানের ছোপে কালো, যেন উচ্ছের বীচি। তারিফ করে আমরা বললুম, বটেই তো।

কত রং-বেরঙের খরিদ্দার আসছিল। কারবারটা প্রায় ধারেই চলে। নগদ পয়সার আমানত দেখলুম না। রাত্রি দশটায় দোকানদার বললে, দোকান বন্ধ করবে। অগত্যা উঠতে হলো।

উঠে পথে এসে দেখি, মেঘ না চাইতে জল। একখানা ট্যাক্সি হুড়মুড় করে একেবারে গায়ের উপর এসে পড়লো। আমরা পথ ছেড়ে দিলুম। ট্যাক্সি থামলে, ট্যাক্সি থেকে কে ডাকলো, হ্যালো!

চেয়ে দেখি চন্দর—সেই বর্মীজ বেশ।

ট্যাক্সি থেকে নেমে চন্দর বললে, শত্রুঘ্ন যে!

আমি বললুম, হ্যাঁ, তুমি কোথা থেকে?

চন্দর বললে, বলো কেন। খিদিরপুর যেতে হয়েছিল। কলেজ থেকে ফিরে দেখি, প্রিন্স টু-লঙের মামা এসে বসে আছেন স্বয়ং। এড়াতে পারলুম না। যত বলি একটি বন্ধু আমার সঙ্গে যাবেন, তত বলেন, একবার চলুন। যেতে হলো। সত্য কি ভাবলে!

আমি বললুম, সত্য তোমার বাড়ীতে বসে আছে।

এ্যাঁ! চন্দর বাড়ীর দিকে চললো। ট্যাক্সিওয়ালা বললে, ভাড়া সাব।

দাঁড়াও ভাই। মিটার দেখে চন্দর ড্রাইভারকে ভাড়া দিল।

চেয়ে দেখি, বিনোদ ইতিমধ্যে ফেরার। অর্থাৎ উবে গেছে। রাগ

ধরলো। তবু সত্যর সঙ্গে চন্দরের সাক্ষাৎ হলে কি ঘটে, দেখবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। চন্দরের পিছনে পিছনে চললুম।

এসে দেখি, সত্যর সামনে টেবিলের উপর থালায় একরাশ লুচি, নানান্ তরকারী এবং সত্য পরমানন্দে সে সবের সদ্ব্যবহার করছে। চন্দরের এক মামা তাকে খাওয়াচ্ছেন। চন্দরকে দেখে মামা বললেন, তুইতো আচ্ছা ইয়ে। বন্ধুর সঙ্গে নিমন্ত্রণে যাবি বলে একে আনিয়ে দিব্যি গা ঢাকা দিয়েছিস্।

চন্দরের মুখের উপর যেন চাবুক পড়লো। চন্দর বললে, হ্যাঁ, মানে, হঠাৎ ভারী ইয়ে হয়ে গেল কিনা। তা তুমি যাও, আমি ব্যবস্থা করছি। মামা বললেন, কিসের ব্যবস্থা করবি! কোথায় তোদের নিমন্ত্রণ ছিল শুনি? বাড়ীর কেউ জানে না। মা ভেবে অস্থির। বললেন, পাড়াগাঁ থেকে এসেছে কলকাতায় পড়তে, কোথায় গেল? গাড়ী চাপা পড়লো না কি? এই স্বদেশীর হুজুগে ধরাই পড়লো বা! কিম্বা চকি হলো? ভারি irresponsible ছোকরা।

ন্দর বললে, দিদিমা ভাবছে, ও! কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটলো অন্দরে। আমার রাগ ধরলো। সারাক্ষণ পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর সত্য এখানে পরম আরামে···বাঃ! কৌতুকে যত আনন্দই থাক্, তার একটা সীমা আছে নিশ্চয়।

বেরিয়ে পড়লুম পথে। এসে দেখি, বিনোদ। বললুম, কোথায় উবে গেছলে?

বিনোদ বললে, ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম, কোথা থেকে এলো? তা সে জবাব দিলে, হেদোর ধার থেকে। ভাড়া উঠেছে আট আনা।

একটা কথা বলতে ভুলেচি। চন্দরের মামার বাড়ী গোয়াবাগানে, অর্থাৎ হেদুয়া থেকে পাঁচ মিনিটের পথ।

তারপর তিনদিন চন্দরের দেখা নেই। চতুর্থ দিনে ইংলিস লেকচার শেষ হবামাত্র জনার্দন এসে খবর দিলে, চন্দর চুপিচুপি ট্রান্সফার নেবার ব্যবস্থা করছে।

আমাদের কৌতুক বেড়ে উঠলো চতুর্গুণ। তখনি মিটিং। সঙ্গে সঙ্গে সকলে এক টাকা, আট আনা চাঁদা দিয়ে ফাণ্ড খোলা হলো। চাঁদা উঠলো একষট্টি টাকা বারো আনা। এই অর্থ সম্বল করে আমাদের নূতন রঙ্গাভিনয়ের ব্যবস্থা হলো।

তুদিনে রাষ্ট্র হয়ে গেল, জনার্দন বিলাত চলেছে এবং তার বিদায় অভিনন্দন উপলক্ষে সচ্চিদানন্দের বাগানে ইভ্‌নিং পার্টি। কার্ডে নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হলো এবং চন্দরের মাতুলালয়ে গিয়ে জনার্দন তাকে নিমন্ত্রণ করে এলো। তাকে মোটরে করে সচ্চিদানন্দ বাগানে আনলো। সে কি আসতে চায়? জনার্দন নাছোড়বান্দা।

চা-পান, ভোজ—আসর বেশ জমজমাট। হঠাৎ একটা মোটর থেকে নামলো বর্মীজ বেশ ধারী এক তরুণ সুপুরুষ। সকলে লাফিয়ে ছুটে গিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করলো, Welcome Prince To Long of Burma.

প্রিন্স-টু-লঙ্‌ এলেন। এসে সকলের সঙ্গে হেসে আলাপ সুরু করলেন। আমি বর্মার সাদা হাতীর কথা পাড়লুম। তিনি জবাব দিলেন, সেগুলো সাদা ইঁহুরের জাত। যেগুলো ইঁহুরের চেয়ে একটু বড় হয় সেগুলো বর্মার হাওয়ায় থেকে হাতী হয়ে পড়ে। একবার একটা হাতী কলকাতায় এনেছিলুম—তা এখানকার হাওয়ায় দেখি, সেটা গিনিপিগ হয়ে গেছে।

বিনোদ প্রশ্ন করলে, শুঁড়টা?

প্রিন্স বললেন, কুঁকড়ে থ্যাব্‌ড়া নাকে পরিণত হয়েছে। এইটুকু বলেই প্রিন্স লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, হ্যালো! ব্রাদার স্যান্দার। দেখি, স্যান্দার চুপিচুপি সরবার উদ্যোগ করছে। তাকে দেখে প্রিন্স বীরবিক্রমে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রিন্সের কবলে পড়ে চন্দর কুঁকড়ে যেন কেঁচো।

প্রিন্স বললেন, ওহো স্যান্দার! I have graced this party simply for you. তারপর তিনি বহু কথা বললেন, স্যান্দারকে

না নিয়ে বর্মায় ফিরবেন না। সেখানে স্পে টিং সীজন শুরু হতে বিলম্ব নেই। বড়লাট সাহেব যাবেন, তারপর নেপালের মন্ত্রী, লর্ড উইল প্রোবেট ডিউক অফ ক্যাস্কিনারা…

চন্দর একেবারে স্পীক্-টি-নট। আমি বললুম, কি, মুখে কথাই নেই যে?

চন্দর বললে, ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে।

প্রিন্স বললেন, আমার গাড়ীতে নেংটি ইঁদুরের আচার আছে। খাশা জিনিষ। মাথাধরায় জেনাস্প্রিনের চেয়ে উপকারী।

আমাদের উচ্চহাস্য এ কথায় গগণভেদী হলো। চন্দর মিনতি করলে, আমায় যেতে দাও, মামার অসুখ।

প্রিন্স বললেন, না, না, ভালো আছেন। মামাবাবুকে দেখে আমি এখানে আসছি।

এমন 'ব্যাভ্রমের' মধ্যেও চন্দর প্রিন্সের পানে চাইতে ভোলেনি। প্রিন্স বললেন, আমায় চিনতে পারছো না ফ্রেণ্ড? সন্দেহ হচ্ছে? Well see……

বলতে বলতে প্রিন্স মাথার ফাটটা খুলে চুলগুলোয় টান দিলেন, অমনি রবারের পাৎলা খোলশ মুখ থেকে খসে পড়লো। খশতে দেখি, মুখোশের আবরণে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্রের মুখ।

বিনোদ বললে, আমার দাদা ফিল্মে অভিনয় করে। লনচ্যানির বই পড়ে মেক্-আপ শিখছে। আমি তার মুখোশ চুরি করে প্রিন্স-টু-লণ্ড সেজেছিলুম। চিনতে কোনো কষ্ট হয়নি চন্দরবাবু?

আর চন্দরবাবু! চন্দরবাবুর মুখ কাগজের মত সাদা।

পূজার বন্ধে দেশে ফিরে নানা গল্পে চন্দর তার বাল্যবন্ধুদের আসর জমিয়ে তুললো। কলকাতায় গিয়ে সে ভারী স্পোর্টস্‌ম্যান হয়েছে। তারই গল্পে সকলকে সে তাক্ লাগিয়ে দিল। খেলার একটা ইউনিফর্ম দেখিয়ে সে বললে, সে হলো মোহনবাগানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড। কি করে হলো? হুঁ! কলেজে একদিন তার প্র্যাকটিশ দেখে মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন গোষ্টপাল মহাখুশী হয়ে মোটরে চড়িয়ে তাকে তাঁদের ক্লাবে নিয়ে যান, তারপর দলে ভর্তি করে নেন! শেফিল্ডকে মোহনবাগান যে এবারে দুটি গোল দিয়েছে সে কার জোরে?

সঙ্গীর দল হাঁ করে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো। তারপর ডালহৌসী আর ক্যালকাটা যে দুটি গোল খেয়েছে, সে গোলগুলি তাদের কে খাওয়ালে? এই চন্দরকান্ত শর্মা। সঙ্গীর দল মহাখুশী হয়ে বললে, জানি, এখানে হা-ডু-ডুতে পাল্লা দিতে না পারলেও ফুটবলে চন্দর গোরা-প্লেয়ার বন্‌বে না, এমন কি কথা আছে!

শুধু ফুটবল? ক্যালকাটা সুইমিং কম্পিটিশনে চন্দরই ফার্ষ্ট হয়েছিল! রেফারিটার ভারী অসহ্য ঠেকলো—পশ্চিমের ছেলে এসে কাপ নিয়ে যাবে! তাই দু'ইঞ্চির গোলমাল তুলে তাকে করে দিলে সেকেণ্ড। রাগে জল ছেড়ে চন্দর ডাঙায় উঠে এলো—প্রাইজ নিলে না। তারপর জন্মাষ্টমীর দিন তাদের ক্লাশের একটি দল শিবপুরের বাগানে যাচ্ছিল পিক্‌নিক্ করতে—একটা ছেলে কেমন বে-টক্করে জলে পড়ে যায়। অতগুলো ছোকরা ভয়ে সব হতভম্ব। চন্দর ঝপ করে জলে পড়ে ডুব-জল থেকে তুলে ছেলেটাকে রক্ষা করে।

এমনি নানা গল্পে চন্দর সকলকে বুঝিয়ে দিলে, কলকাতা সহর তার সাহস আর কশরৎ কীর্তির জোরে গুলজার হয়ে উঠেছে।

কে একজন প্রশ্ন তুললো, চিঠি লিখতিস না কেন রে? জবাবে চন্দর বললে, সময় পাবো কখন, বল? ক্যালকাটা আর হাইল্যাণ্ডারদের সঙ্গে মোহনবাগানের যত ম্যাচ, তাতে আমায় না হলে চলে না। তাছাড়া এই শীল্ডের ফাইন্যাল—সেদিন কলেজের এক প্রফেসরের অসুখ বলে আমাকে তাঁর কাছে থাকতে হলো। মন খারাপ ছিল, খেলতে গেলুম না, তাই। না হলে মোহনবাগানের ভাগ্যে এবারে শীল্ড ফশকায়। হুঁ! যাক, এবারে যা হবার হয়ে গেল, ফিরে বারে জয় মোহনবাগান।

কলকাতায় যখন চন্দর প্রথম যায়, তার মাথার চুল ছিল লম্বা। কলকাতায় গিয়ে মামাতো ভাই তেজুকে ধরে ধর্মতলায় এক হেয়ার কাটারের দোকানে ঢুকে আট আনা পয়সা ফেলে মাথাটিকে যা বানিয়ে বেরুলো, খাশা। পিছন দিকটা কামানো, শাঁস বার করা, সামনে বুলবুলির ঝুঁটি। দেশে সকলে তার মাথা দেখে বললে, এ কি করেছিস রে? সামনের দিকটা ছাঁটবার পয়সা দিসনে বুঝি? হেসে চন্দর বললে,—ও তোরা বুঝবি না। কেল্লার মধ্যে ফুটবল খেলতে গেলে গোরাদের মত এমনি চুল ছাঁটতে হয়। এ হলো কলকাতার স্পোর্টিং ফ্যাশন।

ছুটির তখনো ক'দিন বাকী। হঠাৎ চন্দরের দিদির এক চিঠি এলো। দিদি লিখেছেন, এবারে ছুটিতে আমরা রূপশীতে এসেছি। বাবা মাকে লিখেছি। তাঁদের মত নিয়ে এখানে আসিস। ভাইফোঁটা নিয়ে তারপর কলকাতায় ফিরবি। আমাদের ঠিকানা, প্রবাসবাস, রূপ্‌শী, বি. এন. আর।

চিঠি পড়ে চন্দর লাফিয়ে উঠলো, মার দিশ কেল্লা। সে রূপ্‌শী যাবে। সেইদিনই মার খোশামোদ করে বাপের ওভারকোটটি সে হস্তগত করলো, তারপর বাজার ঘুরে হেয়ার ওয়েল, টুথ ব্রাশ, টুথ পেষ্ট, সেণ্ট,

এমনি সব খুঁটিনাটি জিনিষ কিনে আনলো। ছোট ছোট ভাগ্নে-ভাগ্নী আছে, তাদের জন্য কিনে আনলো কলারবক্স, রেসগেম, লুডো, সেলুলয়েডের পুতুল—এইসব। আর বাপের কথামত পূজা কনসেশন টিকিট কিনে যথারীতি ট্রেণে চড়ে বসলো। এ পর্যন্ত বেশ চললো—তারপর যা ঘটলো শোনাবার মত।

রূপশ্রীতে ট্রেণ এসে পৌঁছুলো পরদিন বেলা তিনটেয়। চন্দর কেবলি টাইম্-টেবলের পাতা উল্টে দেখছে, কখন ষ্টেশন আসে। রূপশ্রীর প্ল্যাটফর্মে ট্রেণ ঢুকতেই সে জিনিষপত্র গুছিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল, ঐ যে প্ল্যাটফর্মে বড় ভাগ্নে ফকিরলাল দাঁড়িয়ে। মনের আনন্দে ট্রেণ থামবার আগে সেই ইউনিফর্ম পরা মূর্তি নিয়ে কামরার দরজা খুলে দিলে এক লাফ! প্ল্যাটফর্মে ছিল একটা কলার ছোবড়া পড়ে—কোন হতভাগা পাজী কলা খেয়ে ছোবড়া ফেলেছিল, লাফ মারতেই চন্দরের পা পড়লো সেই ছোবড়ায়। অমনি ছুম্ করে এক আছাড়! কোন মতে উঠে চন্দর একবার দন্তবিকাশ করলে, তারপর 'কুলি' 'কুলি' করে হাঁক পেড়ে কুলিকে জিনিষপত্র নামাতে বললে।

ফকির এসে বললে, লাগলো মামা?

চন্দর তার পানে চেয়ে হেসে বললে, দূর পাগল। আমরা ফুটবল প্লেয়ার। পড়ে পড়ে গা শক্ত হয়ে গেছে। আমাদের কি লাগে? হুঁ, এবারে মোহনবাগানে খেলেছিলুম্ না—এই লাষ্ট শীল্ড ম্যাচে! হাইল্যাণ্ডারদের সঙ্গে ম্যাচ—ওঃ কি ধাক্কাধাক্কি! সে তোরা আইডিয়া করতে পারবি না।

ভাগ্নে স্পীক্-টি-নট্! মামা এমন মাতব্বর—মোহনবাগানে শীল্ড খেলেছিল! গর্বে তার বুক ফুলে উঠলো। কথা কইবার শক্তিও তার লোপ পেলো।

মোহনবাগানের কথায় চন্দর এমন তন্ময় যে ট্রেণ থেকে কুলি জিনিষগুলো নামালো কি না, সে দিকে হুঁশ ছিল না। ট্রেণ চলে যেতে প্ল্যাটফর্ম খালি হলো। তখন চন্দর দেখে, সর্বনাশ। ওভার-

কোটটা নামানো হয়নি। কিন্তু ভাগ্নের সামনে সে কথা বলে বেকুব হতে পারে না। বাবার ওভারকোট। নগদ ত্রিশটি টাকা দাম। গা কর্‌কর্‌ করতে লাগলো। তার উপর বাবার কাছে বকুনি খেতে হবে। ঐ হতভাগা কলার ছোবড়ার জন্যই না এই কাণ্ড। রাগে ফুটবলী কেতায় সেই ছোবড়াতে সে মারলে এক কিক্‌! ছোবড়া যদি বল হতো আর এটা যদি ফুটবল গ্রাউণ্ড হতো এবং সামনে যদি হাইল্যাণ্ডারের গোল-পোষ্ট থাকতো, তাহলে গোল-কীপারের সাধ্য ছিল না সে বল আটকায়। নির্ঘাৎ গোল হতো। নিজের কিকের জোর দেখে চন্দর নিজেই অবাক হয়ে গেল! হায়রে, এত কায়দা থাকা সত্ত্বেও কলেজটিম তাকে খেলতে নিল না। ইলিয়ট শীল্ডে তাই হেরে মলো ঐ স্কুবার্বন কলেজের কাছে। যেমন দর্প, তেমনি তা চূর্ণ হয়েছে।

প্লাটফর্মের বাহিরে একগাদা পুশ্‌পুশ্‌ গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। তারি একটা নিয়ে মামা-ভাগ্নে বাসায় চললো। গাড়ীতে বসে মামা কলেজের আর নিজের যে গল্প বলছিল, তার নিজের কানেও সেসব কথা ভারী আশ্চর্য রকমের শোনাচ্ছিল। সে কাহিনী যেন এ যুগের নূতন আরব্য উপন্যাস। বাড়ী এসে দিদিকে ভগ্নীপতিকে প্রণাম করে ভাগ্নে-ভাগ্নীর উপহার বণ্টনে তাকে উদ্যত দেখে দিদি বললেন, যা,যা, নে শীগগীর। রেলে অত কষ্ট হয়েছে, ও সব পরে হবে'খন।

হেসে চন্দর বললে, কিছু কষ্ট হয়নি দিদি। জানো না তো, আমাদের এসব কত রপ্ত। সেবারে আমাদের মোহনবাগান ক্লাব খেলতে গেল সেই ইউক্লিড কাপ্‌ কম্পিটিশনে বর্মায়…তা আমি মোহনবাগানের সেণ্টার ফয়োয়ার্ড কি না, যেতে হলো। সে কি কষ্ট…ওঃ, এ তো তার কাছে নস্যি।

ভগ্নীপতি বললেন, যাও না বাবু নাইতে। তোমার দিদি বলছেন, বড় বোনের কথাটা রাখোই না। তোমার ও ইউক্লিডের জিওমেট্রি, আর টাণ্টারের কথা, এ্যালজেব্রা টুর্ণামেণ্টের কথা, পরে শোনা যাবে'খন।

ভগ্নীপতির শেষ কথায় চন্দর একটু ভড়কে গেল। এ্যালজেব্রা টুর্ণামেণ্ট? অর্থাৎ তোমরা বুঝতে পারছো, চন্দরের একথা একদম বানানো। তোমরা তাকে চেনো তো! মোহনবাগানের তাঁবুর ধারেও সে কোনোদিন ঘেঁসতে পারেনি। ঐ এডওয়ার্ডস্ কোম্পানির গ্যালারিতে বসে মোহনবাগানের খেলাই যা দেখেছে! তারপর এ্যাল্জেব্রা টুর্ণামেণ্ট, সে আবার কি? চন্দর চুপচাপ স্নান করতে গেল। দিব্যি বাথরুম। প্রকাণ্ড বাথটবে জল, একেবারে আমীরী কায়দা। স্নান করে চন্দর এসে আহারে বসলো। তারপর ভাগ্নে-ভাগ্নীকে উপহার বিতরণ পর্ব। একটু গল্প-সল্প করে চন্দর ভাগ্নেকে বললে, চলো হে ফকিরলাল, একটু বেড়িয়ে আসি।

ফকির তখন বাপের কাছে লুডোর ছক্ পেড়ে বসেছিল। মামার কথায় বেজায় অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লে। মামা লুডো দিয়েছে, সেজন্য কৃতজ্ঞতা আছে তো!

রূপ্শী বেশ জায়গা। পাহাড় আছে চমৎকার! সন্ধ্যার পর মামা-ভাগ্নে বাসায় ফিরলো তারপর গল্প, আহার, নিদ্রা···

দু'দিনে চন্দরের কাছে রূপশীর পথ-ঘাট রপ্ত হয়ে গেল। বাড়ীর সঙ্গে যা সম্পর্ক, তা ঐ স্নানাহার আর নিদ্রা নিয়ে। তাছাড়া সে বাইরেই ঘোরে। আর রোজ বাড়ী ফিরে মজার মজার খবর দেয়। দিদিকে বললে, কোণে ঐ যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, ওটা এত কাছে দেখালে কি হবে, বাসা থেকে ঠিক পাক্কা দশ মাইল। ওই পাহাড়ে এক মুনির আস্তানা আছে। সেখানে এক যোগী আছেন, তাঁর বয়স আড়াইশো বছর। তিনি চন্দরকে দেখে বলেছেন, চন্দর দেশে একটা কীর্তি রেখে যাবে।

শুনে দিদি বললেন, যাবি রে আমায় নিয়ে?

চন্দর বললে, আমার তো ইচ্ছে হচ্ছে দিদি, কিন্তু যাওয়া সে তোমার শক্তিতে কুলোবে না।

দিদি বললেন, কেন ?

চন্দর বললে, পাহাড়ের কাছাকাছি চার মাইলটাক্ গাড়ীর পথ নেই। সে চার মাইল খালি পাথর আর নদী। তাছাড়া ছোট ছোট আরো গোটা আষ্টেক পাহাড়ে চড়তে হয়! সে কি পাহাড় দিদি! আমি নেহাৎ শক্ত ছেলে তাই…তা আমারো ঐ চার মাইল পথ যেতে চার ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

দিদি বললেন, তাবলে মুনিবরকে দেখবো না রে ? হোক্ কষ্ট, আমি না হয় ওঁকে বলে ডুলির বন্দোবস্ত করাবো। ডুলি পাওয়া যাবে তো ?

চন্দর বললে, উঁহু। ঐ তো মুস্কিল।

দিদি এ কথা স্বামীকে বলতে তিনি বললেন, অগস্ত মুনিকে আবার এখানে কোথায় পেলে চন্দর ?

চন্দর বললে, আমি জানি না। মুনিবর আমায় বললেন….

চন্দরের ভগ্নীপতি নিশীবাবু উকিল। তিনি তখন জেরা স্থুরু করলেন। জবাবে চন্দর রামায়ণ-মহাভারতের নানা কথা পেড়ে বসল।

ভগ্নীপতি তখন বললেন, কাল নিজে চন্দরের সঙ্গে গিয়ে যোগীবরকে বাসায় আনবেন।

কথা শুনে চন্দর চমকে উঠলো। ভগ্নীপতিকে বললে, কিন্তু যোগীবর কাল ভোরেই হরিদ্বার চলে যাবেন বলছিলেন।

ভগ্নীপতি চুপ করলেন।

এমন খুঁটিনাটি কথা আর কত বলি। রোজ রোজ এমনি সব অলীক কাহিনী বলে চন্দর যখন নিজেকে মস্ত উঁচুতে উঠিয়ে বসেছে, তখন একদিন নাকাল হলো কি রকম, সেই কথাটুকু বলে এ পালা শেষ করি।

রূপশীতে বাংলো বাড়ী বিস্তর। আর বাংলো বাড়ীগুলো সব ঠিক এক প্যাটার্নের। সবগুলিই নতুন। সামনে ফটক, তারপর মাঝখানে ফুলগাছের বাগান। বাগানের দুধারে পথ ঘুরে বাংলোর সামনে

গেছে। উঁচু ফ্লোরের উপর বাংলো। বাংলোর ফটকে সব নাম লেখা আছে। চন্দরের ভগ্নীপতির বাংলোর নাম 'প্রবাস বাস'। তার পাশের বাংলোর নাম 'আরাম নিবাস'। তার পাশে 'বিরাম কুঞ্জ', তারপর 'পুলক আশ্রম', এমনি। এই নাম লেখা না থাকলে বিষম গোল বাধতো। এর বাংলোয় ও এসে উঠতো, তার বাংলোয় সে গিয়ে ঢুকতো…সব বাংলো বাইরে থেকে দেখতে এক রকম—কোনো তফাৎ নেই। এবারে সব বাংলো ভর্তি। বাঙালী মাদ্রাজী পার্শী—নানা জাতের লোক-জনে রূপ্‌শী সহর একেবারে গিশ্‌গিশ্‌ করছে।

ভগ্নীপতি রোজ বলেন, এখানে অন্ধকার রাত্রে বাড়ী খুঁজে ঢোকা ভারী শক্ত। দিয়াশালাই জ্বেলে নাম দেখে বাংলোয় ঢুকতে হয়। না হলে কোন্‌টায় ঢুকতে কোন্‌টায় ঢুকবে! চন্দর তাই যেখানে যায়, সন্ধ্যার সময় ফেরে।

সেদিন চন্দর খুব অহঙ্কার করছিল, সে শহরে থাকে—হুঁ, এখানকার বাংলো তার এমন চেনা হয়ে গেছে, যে অন্ধকার রাত্রে দিয়াশালাই না জ্বেলেও সে বাড়ী খুঁজে অনায়াসে আসতে পারে।

ফকিরলালকে বাড়ীতে রেখে বাইসিক্লে চড়ে সেদিন সে বেড়িয়েছিল বিকেলের দিকে। একটা পাহাড়ী পথে ফিরতে বাইসিক্লের টিউব গেল ফেঁশে। সর্বনাশ! ঘাড়ে বাইসিক্‌ল্‌ নিয়ে আসা শক্ত। উপায়? বহুদূর এসে সে সামনে দেখে, পুলিশ ফাঁড়ি! সেখানে গেল। ফাঁড়িতে ছিল এক বাঙালী সাব-ইনস্‌পেক্টর! বাঙালী দেখে চন্দরকে তিনি বসিয়ে চা খাওয়ালেন। চন্দর তাঁকে নিজের বিপদের কথা বলে বাইসিক্‌ল্‌খানি সে রাত্রের মত ফাঁড়িতে রেখে হেঁটে বাসায় ফিরছিল। সে কি একটুখানি পথ! অন্ধকার রাত্রি। তার উপর পথে নানা ক্যাঁকড়া বেরিয়েছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা ঘুরে একখানা বাংলোয় সে ঢুকে পড়লো। অন্ধকারে পকেট থেকে দিয়াশালাই বার করে জ্বালবে, দেখে, একটিও কাঠি নেই। 'প্রবাসবাস' বাংলোয় ঢুকতে যদি আর কোন বাংলোয় ঢোকে? একবার

সে থমকে দাঁড়ালো, তারপর ভাবলো, না, এই বাংলোই ঠিক। চন্দর ফটকে ঢুকলো। ঢুকে দু'পা এগিয়েচে, অমনি বাংলোর বারান্দার একটা কুকুর বিষম বিরক্তভাবে ভৌ-ভৌ করে ডেকে উঠলো। সে শব্দে বাংলোয় ঘরের দোর খুলে তখনি টর্চের আলো ফুটলো এবং ইংরাজী গলায় কে বললে, কোন্ হ্যায় ?

সর্বনাশ। এ যে সাহেবের গলা। তারপর ওটা যখন সাহেবের কুকুর, তখন নিশ্চয়ই ডালকুত্তা। চন্দর তাড়াতাড়ি ছুটে একেবারে রাস্তায় এসে পড়লো! পিছনে কুকুরের চীৎকার। ঐ এলো বুঝি।

পিছনে কুকুরের চীৎকার। ঐ এলো বুঝি। ছুটতে ছুটতে কতখানি পথ যে পার হয়ে এলো।

ছুটতে ছুটতে কতখানি পথ যে পার হয়ে এলো। দম ফুরিয়ে গেছে। ঘেমে উঠেচে। আর পারা যায় না। সে একবার দাঁড়ালো। না,

আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। মাথার উপর এক আকাশ নক্ষত্র! একটু দাঁড়িয়ে তারপর আর একবার এগিয়ে ডানহাতি এক বাংলোয় চন্দর ঢুকলো। এবারে ঠিক বাংলো। আর ভুল নয়।

বাংলোয় ঢুকে একটু এগিয়ে গিয়ে চন্দর দেখে, বাংলোর দোর বন্ধ। সে ভাবলে, আচ্ছা, তার ঘর তো পিছন দিকে—সে ঠিক ঢুকবে ভেবে সেইদিকে চললো।

ওদিকে বাংলোর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে ভিতর থেকে কে বলে উঠলো, কে?

স্বর বাঙালী-মেয়ের।

এ তো তার দিদির গলা নয়! তবে কি এবারও ভুল হলো? এদিকে পা যে রকম ভারী হয়ে উঠেছে, একটু না জিরুলে তাকে চালাবার সামর্থ হবে না। কাজেই একটু পাশ কাটিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। ওদিকে তার জবাব না পেয়ে বাংলোর দরজা গেল খুলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন। চারিধারে আলো ঘুরিয়ে কে বললে, ঐ যে ঐ একটা মানুষ।

সঙ্গে সঙ্গে তেওয়ারী, লছমন, ভুলু বলে ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি। পরক্ষণে মার-মার শব্দে তিন চারজন লোক লাঠিসোঁটা ঘাড়ে বেরিয়ে পড়লো। চন্দর গুড়ি মেরে ফটক পার হয়ে পথে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু ছোটবার-শক্তি আর নেই। তাছাড়া এই অন্ধকারে কোন্‌দিকে ছুটবে? তার চেয়ে…

তেওয়ারী এসে তার মাথার বুলবুলির ঝুঁটি ধরে দিল এক টান। ভিতর থেকে মনিব বললেন, পাকাড়কে লে আও।

তেওয়ারী আর লছমন তখন পাঁজাকোলা করে ঝুলন্ত অবস্থায় চন্দরকে বাংলোর বারান্দায় এনে ফেললে। ভুলু বললে, ঠিক। এই ছোঁড়াই কাল আমার বাইসিক্ল চুরি করেছে বাবা। আজ দুপুর বেলা ওকে দেখেছি বাইসিক্ল চড়ে যাচ্ছিল। এখন আবার এসেছে আর কিছু চুরির মতলবে।

বাবা বললেন, বেঁধে থানায় নিয়ে যা···

চন্দর কাকুতি করে বললে, সে চোর নয়। এ বাংলোয় ভুল করে ঢুকে পড়েছিল।

ভোন্টু বললে, বেটা শয়তান! চোর নয়, মাথায় এই বুলবুলির ঝুঁটি··· বাঁউসাই-খেকো চোর। বলে সে তার মাথার বুলবুলির ঝুঁটি ধরে পিঠে মারলো এক গুঁতো। গুঁতো খেয়ে চন্দর সটান শুয়ে পড়লো।

মেয়েরা বললে, মারধোর করিস্ নে রে! শেষে মারা যাবে। তার চেয়ে থানায় দিয়ে আয়।

চন্দর বললে, তার আগে দয়া করে একটু জল খেতে দাও। আমার জিভ শুকিয়ে গেছে।

ভোন্টু ভারী গোঁয়ার। সে বললে, দেবো বৈকি জল খেতে। ব্যাটা চোর! জল কেন? চায়ের পেয়ালা এনে দিচ্ছি। চা খাবে, না কোকো? বলো দয়া করে···

মেয়েরা বললে, আহা! দে না বাপু একটু জল খেতে।

জল খাওয়া হলে তেওয়ারী আর লছমন একটা গামছায় পিছমোড়া করে বেঁধে চন্দরকে নিয়ে চললো থানায়। বাবু বললেন, আমিও সঙ্গে যাই চ। সবাই বেরিয়ে পড়লো। বাবুর হাতে লণ্ঠন। তেওয়ারী আর লছমন চন্দরকে ধরে নিয়ে পথে এলো।

পা কি চলে। এই মেহনত। তার উপর এই গুঁতো আর মার। এরপর আবার থানা-পুলিশ।

চন্দরের চোখের সামনে পৃথিবীটা কালো গোলার মত বন্‌বন্ করে ঘুরছিলো। পায়ের তলায় পথ যেন ঝড়ের মুখে নৌকার মত দুলচে! মাথা এমন গুলিয়ে গেছলো যে সে কোথায় আছে, কি করছে, কিছু হুঁশ ছিল না! এমন সময় উল্টো দিক থেকে লণ্ঠন ঝুলিয়ে পথে কারা আসছিল। বাবু বললেন, এত রাত্রে কারা বেড়াতে বেরিয়েছে, দেখেছিস?

যাদের লক্ষ্য করে কথাটা বলা হলো, তারা কাছে আসতে চন্দর বলে

উঠলো, ঐ যে উনি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি চোর নই। উনি আমার ভগ্নীপতি।

পথে আসছিলেন চন্দরের ভগ্নীপতি নিশিবাবু, আর তাঁর চাকর হরিয়া।

নিশিবাবুকে দেখে বাবুটি বললেন, নিশিবাবু নাকি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। কে? আরে মলয়বাবু নাকি? সঙ্গে চোর বুঝি?

মলয়বাবু বললেন, হ্যাঁ, আর বলেন কেন। বেটা কাল একখানা বাইসিক্ল চুরি করে নিয়ে গেছে। আজ রাত্রে আবার বাংলোয় ঢুকেছিল। তা খুব ধরা পড়ে গেছে। আজ সকলে হুঁশিয়ার ছিলুম কিনা।

চন্দর বলে উঠলো, আমাকে বাঁচান নিশিদা।

নিশিবাবু বলে উঠলেন, আরে, এ যে আমাদের চন্দর!

আর চন্দর! ঠাগুনির চোটে সে তখন হন্দর হয়ে গেছে। তার মুখের কাছে লণ্ঠন তুলে নিশিবাবু বললেন, হ্যাঁ, চন্দরই যে। এঁর বাংলোয় ঢুকেছিলে কেন? রাত হয়ে গেছে এত, বেড়িয়ে ফিরচো না, সকলে মহা ভাবনায় অস্থির—বাঘের পেটে গেলে, কি ভাল্লুকের থাবায় পড়লে। দেখুন তো মলয়বাবু, আক্কেলখানা। এটি আমার সম্বন্ধী…এত রাত অবধি কেউ হাওয়া খায়? তাই খুঁজতে বেরিয়েছি।

মলয়বাবু বললেন, আপনার সম্বন্ধী! অথচ এমন আহম্মক। এতক্ষণ সেকথা বলতে হয় বাপু। পরিচয় দিলে তো চুকে যেতো। অনর্থক এই চোরের মার খেলে? ছি, ছি!

চন্দর বললে, আজ্ঞে, কোনো কথা বলবার আপনারা সময় দিলেন কৈ? আপনার ছেলে যে মারটা মারলে…

মলয়বাবু বললেন, ভারী গোঁয়ার ছেলে। ফুটবল খেলে কিনা। ও যে মোহনবাগানের প্লেয়ার।

নিশিবাবু চন্দরের দিকে তাকিয়ে বললেন, মোহনবাগানের প্লেয়ার! তাহলে তোমায় চিনতে পারলো না? তুমিও তো মোহনবাগানের শীল্ড প্লেয়ার!

আর প্লেয়ার। চন্দর একেবারে কাবু। মারে এমন কাবু হয়নি, যেমন এই কথায়...

মলয়বাবু বললেন, আগের দিন রাত্রে বাইসিক্ল চুরি গেছলো বলে আজ আমরা হুঁসিয়ার ছিলুম।

নিশিবাবু বললেন, হ্যাঁহে চন্দর, বাইসিক্লের ল্যাম্পটা কোথায় ছিল? সেটা যদি সঙ্গে রাখতে, তাহলে তো এ গোল হতো না।

ঠিক। মলয়বাবু বললেন, এই তুমি না শহুরে ছেলে!

চন্দর কোনো কথা বললো না। তেওয়ারী, লছমন তার পিছমোড়ার বাঁধন খুলে সরে দাঁড়ালো। মলয়বাবু বহু দুঃখ করলেন। পরের দিন চন্দরকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণও করলেন। তারপর তাকে নিয়ে নিশিবাবু বাড়ী ফিরলেন।

তোমরা ভাবছো, পরের দিন চন্দর মলয়বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ গেছলো? রাম বলো। সেখানে ভোন্টু আছে, মোহনবাগানের প্লেয়ার। তার সব জারিজুরি ভেঙে যাবে! বিশেষ করে ভাগ্নে ফকিরলালের সামনে!

পরের দিন দিদিকে বললে, ছুটির ক'টা দিন বা বাকি, বাড়ী যাবো। বাড়ীতে ক'দিন থেকে তারপর কলকাতায় ফিরবো।

যে কথা সেই কাজ—পরের দিন চন্দরের দেশে প্রত্যাগমন।

রূপ্‌শী থেকে আবার দেশের বাড়ীতে···ছুটি এখনো ফুরোয়নি।
সেদিন স্কুলের মাঠে হারানো সঙ্গী সাথীদের নিয়ে আসর জমেছে। আসরে আছে হাবু, নকুল, জগৎ, কান্তি, সনৎ আর চন্দর। চন্দর গল্প ফেঁদেছে···নিজের বাহাদুরির গল্প···কলকাতার গড়ের মাঠে কি করে একটা জাঁদরেল গোরার নাকে জোর ঘুষি কষিয়েছিল! সকলে শুনছে আর গা-টেপাটেপি করছে, এমন সময় বিজয় এসে হাজির···তার হাতে একখানা চিঠি।
চিঠি দেখিয়ে বিজয় বললে, বিজনেস চিঠি—ছোটমামা লিখেছে। লিখেছে, তাদের চন্দনবাগের সঙ্গে সদরবাজারের রেনবো ক্লাব আসছে ফুটবল-ম্যাচ খেলতে—সামনের রবিবারে! কিন্তু চন্দনবাগের সেণ্টার ফরোয়ার্ড রামচাঁদ জ্বরে কোঁ-কোঁ করছে। খেলতে পারবে না! তাই ছোটমামা লিখেছে, আমাদের এখান থেকে একজন ভালো সেণ্টার-ফরোয়ার্ড নিয়ে যেতে হবে ও-ম্যাচে খেলবার জন্য। এছাড়া আমাদের সকলের নিমন্ত্রণ···অতএব যেতেই হবে!
চন্দনবাগ হলো এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। ছোটমামা থাকে চন্দনবাগে।
হাবু বললে, কাকে নিয়ে যাবি? আমাদের মাখন সেণ্টার-ফরোয়ার্ডকে?
সনৎ বলে উঠলো, কিন্তু মাখন তো ওর ফ্যামিলির সঙ্গে ভাগলপুরে গিয়েচে!
তাহলে?
নকুল বললে, কেন, চন্দর মোহনবাগানের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড। ওকে নিয়ে চলো।

সকলে লাফিয়ে সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দি রাইট্ ম্যান ইন দি রাইট্ প্লেস।

সনৎ বললে, কি বলো, চন্দর?

চন্দর ভুরু কুঁচকালো—তার বুকখানা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। তবু বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে সে বললে, কিন্তু আমি তো এখানে আমার ফুটবল-বুট আনিনি···কি করে খেলবো! তাছাড়া হাফপ্যাণ্ট।

নকুল বললে, তাতে কি! সকলের মতো মালকোঁচা এঁটে খেলবি। এখানে কারো ফুটবল-বুট নেই, হাফপ্যাণ্ট পরেও কোনো প্লেয়ার খেলে না।

চন্দর বললে, পাড়াগেঁয়ে মাঠ, খালি পায়ে খেলবো! পায়ে যদি কাঁটা ফোঁটে?

বিজয় বললে, না, না, কাঁটা ফুটবে না। লেভেল করা চমৎকার মাঠ···ত্রিসীমানায় গাছপালা নেই। ফাঁকা মাঠ···তোকে যেতে হবে চন্দর, আমরা ছাড়বো না। দেশের মুখ রাখতেই হবে!

সকলের পীড়াপীড়ি—হ্যাঁ চন্দর হ্যাঁ···তোকে যেতে হবে···যেতে হবে!

চন্দর বললে, কখন যেতে হবে?

বিজয় বললে, ছোটমামা লিখেছে শনিবার বিকেলে না হয় রবিবার খুব ভোরে উঠে ওখানে যাওয়া—দুখানা ঘোড়ার গাড়ি নেবো, ওরা ভাড়া দেবে, যাওয়া-আসার ভাড়া···ওখানে গিয়ে ছোটমামার বাড়ীতে থাকা, খাওয়া···তারপর বেলা চারটায় গ্রাউণ্ডে···খেলা সুরু হবে পাংচুয়ালি এ্যাট ফাইভ।

যাবি তো চন্দর?

চন্দর বললে, যাবো। সকলে বলছো যখন···

একথা তাহলে পাকা, বুঝলি চন্দর!

এখানকার আসর ভাঙবার পর রাত আটটায় সাব-কমিটির মিটিং বসল বিজয়ের বাড়ীতে। সে মিটিংয়ে চন্দর ছাড়া আর সকলে হাজির।

সাব-কমিটির মিটিংয়ে ঠিক হল, চন্দরের উপরে বেশ কড়া নজর রাখতে হবে, চোরের মতন ও যেন না ইতিমধ্যে সরে পড়ে !

রবিবার ভোর হবার আগেই সকলে যা ভেবেছিল ঠিক তাই হলো। সারা বাড়ী নিশুতি। চন্দর নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরুলো। বেরুবামাত্র দেখা সনৎ আর নকুলের সঙ্গে। চন্দর চম্‌কে উঠলো।

নকুল বললে, কোথায় চলেছিস ?

সনৎ বললে, এখনো ভোর হয়নি। একটু পরেই তো গাড়ী আসবে। চন্দর একেবারে কাঁটা। সে ঠিক করেছিল, কোথাও গিয়ে ঘুপটি মেরে থাকবে—তারপর বেলা ন'টা নাগাদ বাড়ী ফেরা ! কিন্তু তা হলো না।

চন্দর বললে, একটু মর্ণিং-ওয়াক। কলকাতায় গিয়ে অভ্যাস হয়েছে কিনা। মর্ণিং-ওয়াক না হলে সারাদিন শরীরে কেমন জুত্‌ পাই না।

সনৎ বললে, ও ! তাহলে আমরাও যাই তোমার সঙ্গে। কিন্তু চটপট ফিরতে হবে। জানিসতো পাংচুয়ালি বেলা সাতটায় এখান থেকে বেরুতে হবে।

যেতে হলো চন্দরকে—যেন পুলিশের খপ্পরে আসামী। তার বুকের মধ্যে যা হচ্ছিল, বলবার নয়। কাকে কি বলবে ? মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, মোহনবাগানে সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলেছিল। ভাবলো, যাক, এতই বা কিসের ভয় ? ফুটবল পোলো খেলা নয়, হাইজাম্পও নয়। পায়ের কাছে বল আসবে, স্যুট করে একটা কিক্‌···এ আর শক্ত কি ! চলে যাবে !

চন্দনবাগে বিজয়ের মামার বাড়ী। ছুপুরবেলায় পেট ভরে খাওয়া হলো ঘি-ভাত, মাংস এবং বিকেল চারটায় অবশেষে ফুটবল গ্রাউণ্ডে ! চন্দরকে নামতে হলো—কথার মান রাখতে হবে···

জয় মা কালী বলে খেলা আরম্ভ হলো। ছোটমামার মুখে হুইসল্—ছোটমামা রেফারি, বিজয় একদিকে লাইনস্‌ম্যান···অন্য দিকে কে, চন্দর জানে না।

ছুদিকে ছু'দলের প্লেয়ার যে যার জায়গায় দাঁড়িয়েছে। টস্ হয়ে গিয়েছে, লাইনের মাঝখানে বল। ছু'দল রেডি। ছোটমামার মুখে হুইস্‌ল বাজলো ফ্-ফ্রু!

প্রথম মুখেই চন্দরের পাশ দিয়ে বল নিয়ে ছুটলো ও দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড। চন্দনবাগের ফরোয়ার্ডরাও ছুটলো তার পিছনে—চন্দর ছু'মিনিট কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো—কি যে করবে—কোন্ দিকে যাবে, বুঝতে পারে না। হঠাৎ মনে হলো, তার দলের সঙ্গে ছোটা উচিত···তখন সে ছুটলো নিজের দলের প্লেয়ারদের পিছনে।

কিন্তু বল আর পায় না। কি করে পাবে? একটিমাত্র বল···তাও যে বলকে আগে ভেবেছিল প্রকাণ্ড—এখন দেখে সকলের পায়ে-পায়ে যেন সেটা একটা মার্বেল! ঐ এক বল নিয়ে এতগুলো প্লেয়ারের গুঁতোগুঁতি। বল এক সেকেণ্ড স্থির থাকে না। ও বল মারতে গেলে কে কখন ল্যাং মেরে দেবে! তবু সে তক্কে তক্কে সকলের পিছনে নাচতে নাচতে কখনো এগুচ্ছে, কখনো পেছুচ্ছে—ফাঁকায় বল পেলে একবার জয় মা কালী বলে একটি কিক্!

মা কালীর দয়ায় বল এসে পড়লো তার পায়ের কাছে—চন্দর কিক্ করবে বলে লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু বলের জন্য ছুটে এলো ইয়া গাঁট্টা চেহারার এক প্লেয়ার—চন্দর তখন কিক্ করবে বলে রুখে উঠেছে—কিক্ করতে গিয়ে বলে পা লাগলো না—উল্টে ডিগবাজি খেয়ে সে পড়লো মাঠের বুকে একদম ফ্ল্যাট!

পড়ে আর ওঠে না। সঙ্গে সঙ্গে রেফারির হুইস্‌ল—খেলা বন্ধ। সকলে ছুটে এলো চন্দরের কাছে—ধরাধরি করে তাকে টেনে তুললো, কিন্তু চন্দর দাঁড়াতে পারে না, খ্যাংচায়। সকলে তাকে পাঁজাকোলা করে গ্রাউণ্ডের বাহিরে নিয়ে এলো। সেখানে তাকে শুইয়ে ফার্স্ট-এড। ওদিকে রেফারির হুইস্‌ল বাজলো···খেলা আবার সুরু হলো, চন্দনবাগের দলে ওয়ান্ ম্যান সর্ট।

খেলা ভাঙলো যথা সময়ে—রেজাল্ট ড্র।

খেলা ভাঙলে সকলে দেখে চন্দর উঠে বসেছে। বিজয়, জগৎ আর নকুল বললে, আরে ছিঃ ছিঃ, একটিবার পা তুলতেই কুপোকাৎ।

উল্টে ডিগবাজি খেয়ে সে পড়ল মাঠের বুকে একদম ফ্ল্যাট।

হাপালি চন্দর। এরা যদি শোনে মোহনবাগানের প্লেয়ার···

চন্দর বললে, খালি পায়ে খেলা অভ্যাস নেই—পা পিছলে গেল!

ছোটমামা এলো, বললে, পা কেমন?

হাঁটু ধরে নাকমুখ সিঁটকে চন্দর বললে, এখানটা সিধে করতে পারছি না।

ডিসলোকেশন নয় তো? বলে ছোটমামা সজোরে চন্দরের হাঁটুতে দিলে মোচড়। চন্দর চেঁচিয়ে উঠলো, উঁ-হু-হু!

ছোটমামা বললে, না না, নাথিং সিরিয়াস। উঠে পড়ো ছোকরা !

বিজয় বললে, ছোটমামা মেডিকেল কলেজে পড়ে…থার্ড ইয়ার। ও যখন বলছে, নাথিং সিরিয়াস, তখন কোনো ভয় নেই।

চন্দরকে উঠতে হলো এবং দলের সঙ্গে যেতে হলো ছোটমামার বাড়ীতে। যেতে যেতে বিজয় বললে, জানো ছোটমামা, লাষ্ট শীল্ডম্যাচে চন্দর মোহনবাগানে সেণ্টার-ফরোয়ার্ড খেলেছিল। ওর গোলের জোরে মোহনবাগান শীল্ড পেয়েছে।

ছোটমামা বললে, ধেৎ! গুল মেরেছে। এখানে দেখলি তো ওর কীর্তি! এ কথা শুনে সকলে হো-হো করে হেসে উঠলো। চন্দর আর স্পিক টি-নট।

বাড়ী এসে হাত পা ধুয়ে ঘরে বসা হলো। ছোটমামা বললে, এখন কিঞ্চিৎ জলযোগ হোক, তারপর রাত্রে ভুরিভোজন। আজ রাত্রে তোমরা এখানে থাকবে, কাল সকালে জলখাবার খেয়ে ঘরে ফিরো।

সকলে বললে, বেশ।

জলখাবার এলো। লুচির গাদা…সেই সঙ্গে আলুপটল ভাজা আর সন্দেশ।

সকলে খেতে বসলো। কিন্তু চন্দর, চন্দর কোথায়?

বহু সন্ধানেও চন্দরকে পাওয়া গেল না।

সঙ্গীরা বললে, মোহনবাগানের চাল মেরে ফেঁসে গেছে তাই নিঃশব্দে সরে পড়েছে।

পরের দিন সকালে বাড়ী ফিরে চন্দরের খোঁজ নিতে গিয়ে বিজয় শুনলো, কাল রাত্রেই চন্দর বাড়ী এসেছিল এবং আজ সকালে উঠে সে গিয়েছে হবিগঞ্জে, তার এক পিসির বাড়ী।

চন্দরের আর একটি কীর্তির কাহিনী······

পূজার ছুটি চলেছে। কলেজ বন্ধ। হঠাৎ একদিন শহরের যত বাড়ীর দেয়ালে-দেয়ালে ইংরেজী আর বাংলা বড় বড় অক্ষরে ছাপা বিজ্ঞাপনের প্ল্যাকার্ড পড়লো :

ইংরেজীতে :

World-famous Wizard
Prof. Raymon
With his big Show
Wonder of Wonders'
Coming shortly to Calcutta !
Watch the Date !!

বাংলায় :

বিশ্ববিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক
প্রোঃ র‍্যামন
সদলে শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছেন।
কবে ? কোথায় ?···তারিখ দেখুন !!

প্ল্যকার্ড দেখে আমরা মেতে উঠলুম···ওপনিং নাইটেই দেখতে যাবো সদলে···আট আনা গ্যালারিতে নয়—দু'তিন টাকার টিকিট কিনে সামনের সীটে বসে দেখবো···দূরে বসলে ম্যাজিকে মজা পাবো না। হোটেলে চপ-কাটলেট খাওয়া বন্ধ করে সকলে পয়সা জমাই···কে জানে, একদিন দেখে আশ্ মিটবে না—বারবার হয়ত দেখতে হবে! পথ চলতে দেয়ালে-দেয়ালে তাকাই, তারিখ দিয়ে আবার প্ল্যাকার্ড পড়লো কিনা! রোজ ভাবি, কাল সে প্ল্যাকার্ড পড়বে, কিন্তু তা আর পড়ে না। রোজই নিরাশ হই!

আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে ভাঙে এমন সময় কলেজ খুললো। অথচ র‍্যামনের দ্বিতীয় প্ল্যাকার্ড পড়ার নাম নেই।
কলেজ খুলতে সকলে কলেজে যাই···প্রোফেশরের লেক্‌চারে মন নেই—মন ঘুরতে থাকে শহরের যত বাড়ীর দেয়ালে-দেয়ালে র‍্যামনের তারিখের প্ল্যাকার্ডের সন্ধানে! ক্লাশে সকলের মুখে ঐ একটি কথা—র‍্যামন! র‍্যামন!···
এখনকার মতো তখন সিনেমার পত্রিকা ছিল না—এবং খবরের কাগজগুলো সিনেমা-থিয়েটার-সার্কাস, এসব নিয়ে হৈ-হৈ রব তুলতো না—কাজেই র‍্যামনের খবর পাবার কোনো আশা ছিল না তখন। আমরা শুধু জপ করছি তারিখ···তারিখ···তারিখ!
চন্দর ছুটিতে দেশে গিয়েছিল। সে এলো কলেজ খোলবার পাঁচ-সাতদিন পরে। তাকে বলা হলো কলকাতার নতুন খবর, বিশ্ববিখ্যাত উইজার্ড র‍্যামন সাহেব আসছে কলকাতায় ম্যাজিক দেখাতে!
এ কথা শুনে বেশ তাচ্ছিল্যভরে চন্দর বলে উঠলো, জানি। র‍্যামন সাহেবের সঙ্গে ট্রেনে ফেরবার সময় আমার খুব আলাপ হলো! পূজা কনসেশনে আমি সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় যাতায়াত করিতো, আসবার সময় যে কামরায় উঠলুম—দেখি, সে কামরায় একজন সাহেব আর তাঁর মেম, খাশ্‌ বিলেতী। একটা সুটকেশে নাম লেখা, দি গ্রেট উইজার্ড র‍্যামন।
আমি বললুম, ধেৎ। বিলেতী সাহেব-মেম—তারা ফার্স্ট ক্লাস ছেড়ে সেকেণ্ড ক্লাসে চড়বে কেন?
চন্দর বললে, ঐ তো, আমি যা বলবো, তাতেই ভুল ধরবেন! জানেন, গ্লাডষ্টোন বরাবর থার্ডক্লাসে ট্রাভ্‌ল্‌ করতেন! ভালো ইংরেজরা ট্রেনে ট্রাভ্‌ল্‌ করতে বাজে পয়সা খরচ করে বাবুয়ানা দেখাতে চায় না!
বিনোদ বললে, থাক্‌, থাক্‌, এ নিয়ে তর্ক নয়। বলুন চন্দরবাবু, আপনার সঙ্গে আলাপ হলো কি করে?
চন্দর বললে, কামরায় আরো ক'জন বাঙালী ছিলেন—তাঁরা

সাহেব-মেম দেখে একটু জড়োসড়ো হয়েছিলেন। আমি কিন্তু সুটকেশে 'উইজার্ড' কথা লেখা দেখেই আলাপ করলুম। বললুম, ম্যাজিকে আমি খুব ইন্টারেস্টেড্—দেখাবে সাহেব দু'একটা ছোট ম্যাজিক? সাহেব ভারী ভালো লোক। তখনি বললে, অল্‌রাইট্। এ কথা বলে সাহেব আমার রুমাল নিয়ে সে রুমালে দিলে আমার চোখ বেঁধে। তারপর বললে, ওয়ান্, টু, থ্রী! ব্যস্, আমি দেখি রুমাল আমার চোখে নেই—আমার রুমালে মেমসাহেবের চোখ বাঁধা!

চকিতের ব্যাপার! আমি ত অবাক! আমি তখনই বললুম, আর একটা স্যার।

হেসে সাহেব বললে, বেশ! বলে মেমসাহেবের হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে দিলে সেটা চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে বাহিরে ফেলে! কামরায় আমরা সব হতবম্ভ!

আমি বললুম, কি করলে সাহেব?

সাহেব বললে, ভেবো না, এরপর যে ষ্টেশনে ট্রেন থামবে, সে ষ্টেশনে গার্ড এসে ওই হাতব্যাগটা দিয়ে যাবে।

হলোও তাই! পরের ষ্টেশনে ট্রেন থামামাত্র দেখি, গার্ডসাহেব এসে সেই হাতব্যাগ দিয়ে গেল সাহেবকে!

বিনোদ বললে, গাঁজায় দম দিয়েছেন কত?

চন্দর বললে, ঐ দেখুন, স্বচক্ষে যা দেখেছি, তাকে বলবো গাঁজা ...বিশ্বাস করবো না! জানেন, ম্যাজিক যারা দেখায়, তাদের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই!

সত্য বললে, রসভঙ্গ করো না, বিনোদ! বলতে দাও—চন্দরবাবুর গল্প বলবার শক্তি অসাধারণ! এ শক্তি নিয়ে পরে উনি অত্যাশ্চর্য গল্প-উপন্যাস লিখে যদি ছাপান, তাহলে সে বই বেচে বহু টাকা পাবেন! আপনি বলুন চন্দরবাবু, তারপর কি হলো?

চন্দর বললে, তারপর যা দেখালে সাহেব, সে আরো অদ্ভুত। একবারে ভৌতিক ব্যাপার!

আমি বললুম, কি রকম ?

চন্দর বললে, তারপরে যা দেখালে সাহেব সে-কথা মনে করতে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। দেখুন, এ কথা বলে চন্দর নিজের হাত প্রসারিত করে দেখালো। দেখি, সত্যিই তার হাতের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে।

এবার খুব চটক্‌দার কিছু শুনবো বলে আমরা উদগ্রীব।

চন্দর বললে, ট্রেন চলেছে। রেল লাইনের দু'দিকে দেখেছেন তো, ধূ-ধূ মাঠ আর জলা থাকে—এক জায়গায় মাঠে এক রাখাল ক'টা ছাগল চরাচ্ছিল—সাহেব জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাহিরে হাত বার করে তিনটি তুড়ি—ব্যস্‌। তুড়ির সঙ্গে সঙ্গে এতবড় একটা ছাগল আমাদের কামরার মধ্যে। মনে হলো, স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু স্বপ্ন যে নয়, তা বুঝলাম ছাগলটার ব্যা-ব্যা আওয়াজে। কামরাসুদ্ধ আমরা সকলে যাকে বলে struck dumb!

সাহেব বললে, দেখছো, ঐ মাঠের ছাগল!

আমরা কি বলবো? মুখে কথা সরে না! তারপর সাহেব বললে ছাগলটাকে, Go back. ব্যস্‌, সঙ্গে সঙ্গে ছাগলও অদৃশ্য!

আমি বললুম, ঐ জানালা দিয়ে উড়ে গেল ?

চন্দর বললে, উড়ে কি লাফিয়ে তা দেখিনি—শুধু দেখলুম, কামরায় ছাগল নেই।

হাসতে হাসতে সত্য বললে, থামুন চন্দরবাবু, আর গল্প নয়। এ তিনটি গল্প হজম করতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে। এর বেশী হলে পেটের ব্যামো হবে।

বিনোদ বললে, সাহেব কলকাতায় আসবে কবে কিছু বললে ?

চন্দর বললে, হ্যাঁ, তারপর খুব ভাব হলো আমার সঙ্গে। আমি বললুম, সাহেব, লেখাপড়া শিখে বাঙালীরা উকিল হয়, হাকিম হয়, ডাক্তার হয়, অথচ ম্যাজিকের দিকে মন নেই—আমি তোমার ছাত্র

হবো—তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো, আমাকে এই আশ্চর্য ম্যাজিক শেখাতে হবে।

সাহেব খুশী হয়ে বললে, আমি যখন চায়নায় যাই, তখন দুটি চীনা ছেলে আমাকে ধরে ম্যাজিক শিখেছে। তারা ম্যাজিক দেখিয়ে বেশ নাম আর টাকা-পয়সাও করেছে। শেখাবো তোমাকে।

বিনোদ বললে, সাহেব কলকাতায় আসবে কবে?

চন্দর বললে, বলেছে, কলকাতায় আসতে দেরি হবে। কলকাতায় আসবার আগে সাহেব যাবে লালগোলা, মুর্শিদাবাদ আর বর্ধমান—এ তিন জায়গায় ম্যাজিক দেখিয়ে তারপর কলকাতা। বললে, কলকাতায় এসে গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে থাকবে—আমাকে বলেছে, কলকাতায় সাহেব এলে আমি যেন গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। বলেছে, আমাকে ফার্স্ট ক্লাসের ফ্রী-পাশ দেবে—সেই পাশে যতদিন খুশী আমি তার ম্যাজিক দেখবো—আমার পয়সা লাগবে না।

আমি বললুম, আমাদের এক-আধ দিন ফ্রী-পাশ দেবেন চন্দরবাবু, আমাদের পয়সার এমন সামর্থ নেই যে দু'বারের বেশী তিনবার টিকিট কিনে ম্যাজিক দেখবো।

চন্দর বললে, তার আর কি, সাহেবকে বলে আমি আপনাদের ফ্রী-পাশে দেখবার ব্যবস্থা করে দেবো!

সেদিন ঐ পর্যন্ত—ওর বেশী ঘাঁটালুম না। এ সব গল্প সহ্য করার একটা সীমা আছে তো।

ডিসেম্বর মাস। দেয়ালে দেয়ালে প্ল্যাকার্ড পড়লো:

> প্রোঃ—র‍্যামনের ম্যাজিক
>
> স্থান—অপেরা হাউস
>
> খেলার তারিখ—১৫ই ডিসেম্বর, সন্ধ্যা ৬টা।

আমরা রেডি হলুম—টিকিট বিক্রী আরম্ভ হবামাত্র টিকিট কিনবো।

এমন সময় এক মজার ঘটনা ঘটলো।

মনে আছে, সেদিন ডিসেম্বর মাসের দশ তারিখ!

আমাদের সচ্চিদানন্দ কলেজে এসে আমাদের একধারে নিয়ে গিয়ে বললে, আশ্চর্য ব্যাপার হে···

আমরা বললুম, কি আশ্চর্য ব্যাপার?

সচ্চিদানন্দ বললে, উইজার্ড র‍্যামন সাহেব কলকাতায় এসেছেন··· তিনি আমাদের বাগানবাড়ীতে থাকবেন। তিনি সাহেব নন, বাঙালী ···নাম রমণীবাবু। আমার এক মেশোমশাই থাকেন বোম্বাইয়ে— সেখানে তাঁর বড় কারবার। এই রমণীবাবু হলেন তাঁর ভাইপো··· খুব ভালো ম্যাজিক জানেন। বিলেত থেকে শিখে এসে নানা জায়গায় ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। তিনি নিয়েছেন বিলেতী নাম—র‍্যামন। বলেন— বাঙালী রমণীবাবুর ম্যাজিক বললে, লোক আসবে না টিকিট কিনে সে ম্যাজিক দেখতে—তাই এই বিলেতী নাম। মেশোমশাইয়ের চিঠি নিয়ে তিনি আমাদের বাড়ী এসে উঠেছেন। সঙ্গে অনেক সরঞ্জামপত্র-লোকজন···আমাদের বাড়ীতে জায়গা হবে না, তাই বাগানবাড়ীতে থাকবেন।

আমরা বললুম, আর চন্দর কিনা···

সচ্চিদানন্দ বললে,—সেই বার্মিজ্ প্রিন্স টু-লঙের মজা করতে হবে।

তার মানে?

সচ্চিদানন্দ বললে, কাল বিকেলে রমণীদা আসবেন আমাদের বাড়ী··· অপেরা হাউসে ষ্টেজ দেখে তারপর এসে আমাদের ওখানে চা-খাবার খেয়ে রাত্রে বাগানবাড়ীতে ফিরবেন। আমি ভাবছি, চন্দরকে বিকেলে আমাদের ওখানে আনতে হবে। বলবো, কাল আমার জন্মদিন!

আমরা মেতে উঠলুম, খাশা হবে। ওর র‍্যামন-সাহেবের অত গল্প··· হুঁ! কিন্তু ওকে আভাসেও এ কথা জানিও না!

না। বলবো, আমার জন্মদিনের পার্টি!

তাই হলো। সচ্চিদানন্দ বললে, আমাদের সকলকে। কাল তার জন্মদিন। তাই তার বাড়ীতে বিকেলে আমাদের চা-জলখাবারের নেমতন্ন। চন্দর পাছে কোনো আভাস পেয়ে সরে পড়ে, এজন্য সত্য আর বিনোদ তাকে একেবারে লেপ্‌টে রইলো।

তখন ঠিক সন্ধ্যা হয়েছে···

সচ্চিদানন্দের বসবার ঘরে আমাদের আসর। চন্দর সরে পড়তে পারেনি —সত্য আর বিনোদের সঙ্গে এসেছে। নিঃসংশয় তার মন। র‍্যামন সাহেবের রহস্য সে ইঙ্গিতেও বুঝতে পারেনি।

চায়ের সঙ্গে কচুরি-সিঙাড়া চলেছে আমাদের আসরে—সচ্চিদানন্দ এলো তার রমণীদাদাকে নিয়ে। রমণীবাবুকে আমরাও এই প্রথম দেখলুম। তিনি অপেরা হাউস থেকে ফিরে বাড়ীর ভেতরে মেয়েদের কাছে ছিলেন। তাঁকে এ ঘরে এনে সচ্চিদানন্দ বললে রমণীবাবুকে, এই আমাদের সেই বন্ধু চন্দর, যার কথা বলেছিলুম—এর সঙ্গে তোমার ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়েছিল—হাত-ব্যাগ আর ছাগলের ম্যাজিক দেখিয়েছিলে!

এ কথায় রমণীবাবুর দু'চোখে যে বিস্ময় ফুটলো, তা আমার আজও মনে আছে!

তিনি বললেন, ট্রেনের কামরায় আলাপ! ছাগলের ম্যাজিক! কবে?

সচ্চিদানন্দ বললে, পূজার ছুটির পর লুপ-লাইনে ও ফিরছিল কলকাতায়, তুমিও নাকি সেই ট্রেনে—এক কামরায়······

রমণীবাবু বললেন, লুপ-লাইনে আমি আজ পর্যন্ত যাইনি, আমি কলকাতায় আসছি সোজা বোম্বাই থেকে। নেমেই তোমাদের বাড়ীতে আসা।

চন্দরের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার খাওয়া বন্ধ। কী তার মূর্তি, তা আমি লিখে বোঝাতে পারবো না!

সচ্চিদানন্দ রমণীবাবুর কাছে চন্দরের মুখে শোনা র‍্যামন সাহেবের কাহিনীটি আগাগোড়া বললে।

রমণীবাবু হো-হো করে হাসলেন, বললেন, খুব প্রাক্‌টিকেল্ জোক্ করেছিলেন তো উনি!

সচ্চিদানন্দ বললে, জোক্ নয় রমণীদা। উনি সব সময় বড় বড় কথা বলেন এবং খুব সিরিয়াস্‌লি—নো জোক্।

এই পর্যন্ত বলে চন্দরের দিকে চেয়ে সচ্চিদানন্দ বললে, ইনিই হলেন উইজার্ড র‍্যামন সাহেব, চন্দরবাবু! খাশ বিলেতী রঙ নয়, আমাদেরই মতো শ্যামবর্ণ বাঙালী—এঁর নাম রমণীবাবু, সম্পর্কে আমার দাদা! কাজেই আপনার সে গল্প—

সচ্চিচ্চদানন্দর কথা শেষ হলো না—ঝড়ের দম্‌কা ঝট্‌কায় গাছের শুকনো পাতা যেমন স্থুট করে কোথা থেকে কোথায় উড়ে যায়, চন্দরও তেমনি নিমেষে উধাও!

আমরা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, হন্‌হনিয়ে চ'লে চন্দর পথের মোড় বাঁকছে।

অনেকদিন পরের কথা। বিনোদের বোনের বিয়ে। সে বিয়েতে আমাদের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। দল বেঁধে গেছি।

মস্ত চাঁদোয়ার নীচে বরের আসর। বর বিয়ের আসরে বসে আছে। আসরে গান-বাজনা চলছে—আমরা শুনচি। কানের কাছে মুখ এনে বিনোদ বললে, খেয়ে নিতে চাওতো চুপি চুপি উঠে পড়ো। দক্ষিণের বারান্দায় ক'টা টেবিলে পাত পড়েচে।

রাত্রি দশটা বাজে। বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়ে গান-বাজনা, বায়োস্কোপ প্রভৃতির যত আকর্ষণই থাকুক—মন পড়ে থাকে ঐ পাতার দিকে। পাতা পড়লে হয়! খাওয়া চুকলে মনটা হাল্‌কা হয়, তখন যত খুশী গান শোনো, মনে কোন চাঞ্চল্য থাকে না। শরীরের সঙ্গে মনের যে অতি নিকট সম্পর্ক, এ ঘটনা থেকেও তা বেশ বোঝা যায়। এমন দৃষ্টান্ত ফিলজফির কোনো কেতাবে দেখি না! ফিলজফাররা পণ্ডিত লোক, হাতের কাছে সহজ দৃষ্টান্ত কবে আর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন?

আমরা দলে ছিলুম আটজন। বিনোদের ইঙ্গিতে উঠে পড়লুম এবং ভারী সতর্ক ভঙ্গীতে দক্ষিণের বারান্দায় এসে চেয়ার অধিকার করে বসলুম। টেবিলে পাতা পড়েচে। ভাজা, ডাল, ছ্যাঁচড়া প্রচুর, শুধু লুচি এলেই হয়! লুচি এলো। ভোজের প্রথম অঙ্কে কারও মুখে কথা নেই…গভীর মনোযোগে ভোজ্য-বস্তুর সদ্ব্যবহারে সকলে মত্ত। এমন সময়…

পাশের ঘরেও ভোজের আসর! লুচি আনো, কালিয়া আনো, এমনি হাঁক-ডাকের মধ্যে থেকে একটা কথা কানে গেল। স্বর পরিচিত। কথা হচ্ছিল রাঁচি সম্বন্ধে। বক্তা বলছিল, এবারে পূজার বন্ধে…

মানে ছুটিতে, কোথাও বেড়াতে না গেলে স্বস্তি মেলে না···তাই গিয়েছিলুম রাঁচি। হাজারিবাগ জেলা, বাঘের মেলা। শহর হলে কি হবে···আমার একটা ধারণাই ছিল, এ জেলার পথ-ঘাট নিরাপদ হতে পারে না।

রাঁচির পাহাড়, রাঁচির পাহাড়,
কে বলে ছোট্টো তুচ্ছ হে ?

সেদিন বেলা তখন চারটে—আমার কেমন বাতিক হলো পাহাড়ে চড়বো ! একটু-আধটু কাব্য-চর্চা করি কি না। রাঁচি পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের এক ঠাকুর আছে। ছোট মন্দির···তার মধ্যে কতকগুলি সিঁদুর-ল্যাপা নুড়ি-পাথর ! মন্দিরের গায়ে হেলান্ দিয়ে

দূর-প্রান্তরের পানে চেয়ে আছি—রৌদ্রে চারিদিক ঝক্‌মক্ করচে। অতীত ভারতের অতীত গরিমার ছবি আমার মনের পটে ফুটে উঠছিল! নিজের মনে কাব্য রচনা করচি···
পাশের ঘরের কথা শুনে আমরা বাক্য হারা! রীতিমত লেক্‌চার! বক্তা একবার থামলো—তারপর আবার সুরু করলো, হ্যাঁ, কবিতার দুটো লাইন আমার এখনও বেশ মনে আছে···

রাঁচির পাহাড়, রাঁচির পাহাড়,
কে বলে ছোট্টো তুচ্ছ হে?
পুটুশের ফুলে শোভিছে গা তব,
যেন ময়ূরের পুচ্ছ রে!

ঘরে উচ্চ হাস্যরোল উঠলো! আমরাও সে হাসির প্রতিধ্বনি তুললুম। কালিয়া যে এনেছিল এ হাস্যরোলে তার কেমন বিভ্রম জাগলো··· পাতে কালিয়া দিতে গিয়ে একজনের গায়েই দিয়ে বসলো! হৈ-হৈ রব বাড়লো!
সে-রব থামলে, ঘরের মধ্যে আবার বক্তৃতা সুরু হলো। ভাবে মশ্‌গুল হয়ে আছি, হঠাৎ পাশে 'হালুম' শব্দ আর মস্ত দুটো চোখ··· আগুনের ভাঁটার মত জ্বল্‌জ্বলে এবং গায়ে ভীষণ বোটকা গন্ধ। ভালো করে চেয়ে দেখি, ইয়া এক কেঁদো বাঘ!
ঘরের মধ্যে চমকিত কোরাশ জাগলো, বলেন কি মশায়? বাঘ! বক্তা বললে, বাঘ! জ্যান্ত বাঘ! মনে হলো, সারা আকাশ যেন ভয়ে পাঙাশ্ হয়ে গেছে! আমার চমক্ ভাঙলো! সামনে বাঘ··· ইঃ, বসে থাকা চলে না! পাশে ছিল একটা বাঁশের লাঠি, ঝালদা থেকে কেনা! ভারী মজবুৎ! চক্ষু মুদে সেই লাঠি ঘুরোলুম! ঠক্ করে একটা শব্দ হলো! চেয়ে দেখি, বাঘের দেহ লুটিয়ে পড়েছে! আর মাথাখানা? মার্বেলের মত গড়াতে গড়াতে নীচে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে!
মুহূর্তের স্তব্ধতা! পরক্ষণে বক্তা বললে, তোমারা Miracle মানো

না! ভাবো সেকালেই Miracle ঘটতো? তা নয়? Miracle একালেও ঘটে!

মানুষের সহ্য করবার একটা সীমা আছে। সে সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মাছের মুড়ো পাতে পড়ে রইলো…উঠে সে ঘরে ঢুকলুম। ঢুকে দেখি,… ঠিক। যা অনুমান করেছিলুম! এমন কাহিনী বলবার শক্তি রাখে শুধু একজন। সে আমাদের চন্দর! এখানেও দেখি, বক্তা সেই চন্দর। চালিয়াৎ চন্দর। আমায় দেখবামাত্র সে চুপ। যেন রাঁচির বাঘকে সত্যই আবার চোখে দেখচে। মুখে তেমনি আতঙ্কের ছায়া!

আমি বললুম, তাইতো ভাবি, কোন্ বীর এমন শিকার করে? আমাদের বাক্য-বরকন্দাজ চন্দর।

আমার কথা শুনে চন্দর আমার পানে চাইলো। তার মুখে যেভাব দেখলুম, দেশী-বিলাতী কোনো মাসিকপত্রের আর্টিষ্টকে তেমন চকিত ভয়ের ছবি তুলিতে আঁকতে দেখিনি।

চন্দর তখনি চোখ নামালো! পাশে আমাদের বয়সী কয়েকজন যুবা এবং দু'চার জন প্রবীণ খেতে বসেছিলেন।

একজন প্রবীণ ব্যক্তি বললেন, ছেলেটিকে চেনো বাবা?

হেসে আমি বললুম, চিনি বৈকি! আমাদের বন্ধু। ম্যাজিসিয়ান উইজার্ড র‍্যামন সাহেব সেবার কলকাতায় এসেছিলেন, তখনই ওর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।

প্রবীণ ব্যক্তিটি বললেন, খেতে বসেচো, খাও। তা না গল্পে একেবারে স্বর্গ- মর্ত্য উপড়ে রসাতলে ফেলচে! চোখে-মুখে কথা কইচে। আর তাও কি সাধারণ কথা! বাপরে!

হেসে আমি বললুম, চন্দর একটু বেশী কথা কয়। তার কারণ experience অনেক বেশী। কি বলো চন্দর? তা তোমার ফ্রেণ্ড— সেই প্রিন্স অফ বর্মা কোথায়? এখানে নেমন্তন্নে আসেননি?

চন্দর চুপ। মাথা তোলে না। আর সকলের মুখে চাপা হাসির ঢেউ ফুটে চকিতে মিলিয়ে গেল।

আমি বললুম, আপনারা রাঁচির এ কী গল্প শুনচেন! চন্দরকে ধরুন, ওর সুন্দরবনের কাহিনী বলতে বলুন, শুনলে রোমাঞ্চ হবে! সেই যে ক্যানিবলগুলো—কি করেছিল চন্দর? বলো না—

সকলের অনুরোধ সুরু হলো, বলুন মশাই, ক্যানিবলদের কথা বলুন—দয়া করুন—

চন্দরের সেদিকে গ্রাহ্য নেই! যেন কে কাকে কি বলচে!

ছোকরার দল থেকে একজন বলে উঠলো, আর ক্যানিবলে কাজ নেই মশায়। রাঁচি পাহাড়ে যে-বাঘ তুলেচেন, তারপর ঐ এক লাঠিতে তার মাথা খশানো—ওঃ! হ্যানিবলের অবধি তাক লেগে যেতো। গল্প বটে! ছেলেবেলায় আমগাছের ডাল ঢের ঠেঙিয়েচি—একটা কাঁচা আমও ডাল থেকে খশাতে পারিনি! আর এ একেবারে আস্ত বাঘের মাথা! বাহাদুর সিং!

আর একজন বললে, তাছাড়া রাঁচি নর্থ পোলের কাছে নয়। আমরা দু-চারজন রাঁচিতে গেছি এবং রাঁচি পাহাড়েও অনেক বার চড়েছি। কিন্তু বাঘ কি, একটা কুকুরও সে পাহাড়ে দেখিনি।

প্রথম ছোকরাটি বললে, হ্যাঁ মশায়, ও চন্দরবাবু, রাঁচি শহর চক্ষে কখনো দেখেচেন? না, মাসিকপত্রের পাতা থেকেই রাঁচির সঙ্গে যা কিছু পরিচয়।

চন্দর মাথা তুললো, তুলে সঝঙ্কারে বললো, এ কথার মানে?

ছোকরাটি বললে, আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়ে মানে বুঝতে পারচেন না? ওয়েবষ্টার চাই!

চন্দর বললে, না, মানে বুঝতে পারচি না। শুনি—

ছোকরা বললে, নিছক মিছে কথা বলে যাচ্ছেন আর কি! ভাবচেন, হাঁদারাম সব বরযাত্রী। তা এসব কথা মাসিকপত্রে চলতে পারে, আসরে নয়!

চন্দর বললে, কি! আমি মিথ্যাবাদী?

ছোকরা সে কথার জবাব না দিয়ে হাঁকলো, কালিয়াটা আর একবার

এদিকে দেখাবেন মশায়—

আমি বললুম, চন্দর এখানে কোথা থেকে এলে ?

ছোকরা বললে, উনি হলেন বরের কিরকম খুড়ো—কাজেই আমাদেরও খুড়ো ! তাই যা বলচেন, চুপচাপ শুনে যাচ্ছি। প্রতিবাদ তুলে খুড়ো-মশায়ের অপমান করতে পারি না তো !

মুখখানা বিকৃত করে চন্দর বললে, থাক্, আর খুড়ো-ভক্তি দেখাতে হবে না।

ঘরে আবার হাসির রোল উঠলো।

চন্দর বললে, সকলে কি বলতে চাও শুনি ? আমার গায়ে জোর নেই ? না, রাঁচিতে বাঘ নেই ? কোন্‌টা মিথ্যা বলেচি ?

ছোকরা নাছোড়বান্দা। সে বললে, ছটোই মিথ্যা।

কি ! সগর্জনে চন্দর উঠে দাঁড়ালো। অমনি চারিদিক থেকে হাঁ হাঁ রব—খাওয়া নষ্ট হবে। খাওয়া নষ্ট হবে। করেন কি মশায় !

চন্দর বললে, হোক খাওয়া নষ্ট। তা বলে এত বড় অপমান সয়ে খাবো ? কেন ? খেতে কি পাই না কখনো ?

ছোকরার সঙ্গে তর্ক বেধে গেল। অতি কষ্টে আপোষ নিষ্পত্তি হলো, Come on fight—কশরতি দেখাতে হবে! বাজী! চন্দর গায়ে কত শক্তি ধরে, তার পরখ চাই! পরখ......

চন্দর বললে, অল রাইট্! কবে দেখাতে চাও ?

ছোকরা বললে, কাল।

চন্দর বললে, চলো রাঁচি।

ছোকরা বললে, রাচি কেন, গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ধারে।

চন্দর বললে, বেশ। কখন ?

ছোকরা বললে, বেলা চারটেয়।

চন্দর বললে, O. K. Punctually at 4 p. m.

হুযুগ মন্দ নয়। বেলা চারটায় মনুমেণ্টের ধারে গিয়ে জুটলুম। দেখি, সে ছোকরা এসেচে। আলাপ হলো। তার নাম শচীন। স্কটিশ

চার্চে থার্ডইয়ারে পড়ে। চন্দরের যে ভাইপোর বিয়ে হলো, সে তার বন্ধু।

বেলা চারটেয় চন্দর এসে হাজির। শচীন বললে, কি রকম পরখ হবে? কুস্তি লড়বেন? না পাঞ্জা? না গাঁট্টা?

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে চন্দর শচীনের পানে তাকালো, আপনি! আপনি কে মশায়?

শচীন বললে, কাল সেই কনের বাড়ী বরযাত্রীর দলে ছিলুম—যার সঙ্গে আপনি বাজী রেখেছিলেন!

চন্দর বললে, বাজী! হাঁ, বাজী রেখেছিলুম, এবং সেইজন্যই এখানে এসেচি। কিন্তু—

কিন্তু কি?

চন্দর বললে, আপনার সঙ্গে আমি বাজী রাখিনি। যার সঙ্গে বাজী রেখেছিলুম, তাকে ডাকুন। ওসব ধাপ্পা চলবে না! হুঁ হুঁ!

শচীন অবাক! আমিও তাই! চন্দর আমাদের পানে চেয়ে হাসলো, বললে, ছাখো না আমার কাছে এসেছেন জালিয়াতী করতে। ও-চাল চলবে না, চলবে না।

শচীন বললে, চালাকি রাখুন মশায়। চাল কি! আসুন······

চন্দর বললে, Dueling এর আইন-কানুন জানেন? Dueling হলো বিলিতী ব্যাপার! এ সম্বন্ধে পড়াশুনা তো করেননি! এর আইন বড় কড়া। যার সঙ্গে বাজী রেখেছিলুন, তিনি আসুন—দেখিয়ে দি, আমার লাঠিতে বাঘের মাথার মত মানুষের মাথাও ছিট্‌কে খসে পড়ে কি না!

শচীন চন্দরের হাত ধরলো, চালাকি নয়—আসুন।

চন্দর হেসে আমার পানে চাইলো, বললে, ছাখো ভাই, তামাসা ছাখো।

তামাসা না হোক, শচীনের ভঙ্গী যা দেখলুম, তাতে বুঝলুম, সে বেশ চটে উঠেচে। তার মুখ-চোখ লাল—

হাত ছাড়িয়ে চন্দর বললে, কোনো আপত্তি ছিল না। তবে এ হলো বিলিতী স্পোর্ট। Duel-এর আইন বড় কড়া! কাজেই—

শচীন বললে, বাঃ!

চন্দর বললে, চমৎকার আইন মশাই। আমি বলি, খাশা আইনের দেশ ঐ বিলেত, মারামারিতেও আইন বেঁধে দেছে। এ তো দেশী খেলা নয়। এ হলো duel। তাই বলি, বিলিতি sports-এর আইন-কানুন শিখতে চান, ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে যান। ভালো ভালো বই আছে। Knowbloch's Dueling খানা আগে পড়বেন। তা হলে নমস্কার। আসবে না কি হে শত্রুঘ্ন?

আমি বললুম, না।

তোফা সপ্রতিভ ভঙ্গীতে চন্দর চলে গেল। শচীন আমার পানে চাইলো। আমি বললুম, চন্দরের অনেক উন্নতি হয়েছে দেখচি।

এর তিন চার দিন পরের কথা।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, বায়স্কোপ দেখতে যাবো, তাই ট্রামের প্রতিক্ষায়। সঙ্গে আছে বিনোদ আর সত্য।

হঠাৎ সত্য বললে, ঐ ছাখো কে?

আলবার্ট হলের গেটের দিকে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। চেয়ে দেখি, চন্দর। সঙ্গে আরো তিন চারজন ছোকরা। চন্দর অনর্গল কি বকচে, আর সঙ্গীগুলো, তাদের যেন তাক্ লেগেচে, এমনি ভাব। পা-টিপে এগিয়ে গেলুম। চন্দরের নজরে না পড়ি, এমনি সতর্কভাবে। শুনলুম, চন্দর বলছে, হুঁ, মনুমেণ্টের ধারে প্রায় পাঁচশো লোক জড়ো হয়েছে। কি ভিড়! আমার তো দেখছো এই শরীর। আর তাদের দলে, জনে জনে স্যাণ্ডোর সাক্রেদ। সব জাপানে গেছলো, জিউৎসুতে ওস্তাদ। বারোটা করে মেডেল গলায় ঝুলছে। আমায় attack করলে, অমনি দিলুম এক উল্টো প্যাঁচ। বাছাধনরা ঠিকরে কার্জন পার্কের মধ্যে গিয়ে পড়লো। হুঁ, রোগা পটকা দেহ হলে কি হয়, মাশ্‌লের এমন সব কায়দা-কানুন আমি জানি! এরি জোরে

সেবারে…কন্‌খলে গেছেন কেউ ? নীল-ধারা দেখেছেন ? জলের সেই কি ভয়ঙ্কর তোড় ! সে-তোড় এই মাশ্‌লের জোরে ঠেলে আমি গিয়ে উঠেছিলুম একদম সেই লছমন-ঝোলায় ! সঙ্গে ছিলেন প্রিন্স অফ অর্গাণ্ডি আর কোয়েটার গভর্ণরের ছেলে। তারা তো তলিয়ে উল্টো দিকে ভেসে গেল—একদম সেই হুগলীর পুলের তলায়। খুঁজেই পাই না। এমন কাণ্ড !

আমি ডাকলুম, চন্দর !

চন্দর সে-ডাকে চম্‌কে উঠলো। চম্‌কে কেঁপে আমার পানে চাইলো। চকিত চাহনি ! পরক্ষণে এসে একেবারে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বললে, হ্যালো, শত্রুঘ্ন ! আরে, তোমাকেই যে আমি খুঁজছিলাম। ভারী দরকার আছে।

আমার চমক ভাঙবার পূর্বেই আমায় টেনে সে হ্যারিসন রোডের মোড়ে নিয়ে চললো।

আমি বললুম, কি দরকার ?

চন্দর বললে, এমন কিছু নয়। সেদিনকার কথাটা ফাঁশ করো না। পুরানো বন্ধু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! আজ আসি ভাই…তাড়া আছে। ঐ যে ট্রাম—

চন্দর গিয়ে টকাশ করে ট্রামে চেপে বসলো। ট্রামখানা যাচ্ছিল হাওড়ার পুলের দিকে।

আমি তো অবাক! আচ্ছা ছেলে যা হোক! সে-চাল আজও বদলায়নি।

শেষ